নেতাজী অন্তর্ধান রহস্যে কংগ্রেসের দোসর কমিউনিস্টরাও
.. পৃঃ ১৬

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

উর্দু সমাচারপত্রে স্বীকারোক্তি : ক্রমবর্ধমান মুসলমান জনসংখ্যা
.. পৃঃ ২৭

৬৭ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা।। ১৮ মে ২০১৫।। ৩ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

রাসবিহারী ও সুভাষচন্দ্রের ‘বৈপ্লবিক সম্পর্ক’

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

১৮ মে - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

খোলা চিঠি : দিদি ধর্ম, দিদি কর্ম, দিদি হি....
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

নেতাজী-ভীতিই জওহরলালকে নেতাজী পরিবারের ওপর নজরদারি করতে বাধ্য করেছিল ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ১২

রাসবিহারী বসু : সুভাষচন্দ্র— এক বৈপ্লবিক সম্পর্ক
▯ ড: প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ▯ ১৪

নেতাজী অন্তর্ধান রহস্যে কংগ্রেসের দোসর কমিউনিস্টরাও : পূরবী রায় ▯ সারথি মিত্র ▯ ১৬

নেতাজীর অন্তর্ধানের সাত দশক : সত্য সামনে আসবে?
▯ অভিরূপ নাগচৌধুরী ▯ ১৮

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী সংক্ষিপ্ত পরিচয়
▯ অশোক কুমার ঠাকুর ▯ ২১

ভালোবাসার ধনকে হারিয়ে নতুন করে পাওয়া
▯ চতুর্থ পাণ্ডব ▯ ২৩

উর্দু সমাচারপত্রের স্বীকারোক্তি : ক্রমবর্ধমান মুসলমান জনসংখ্যা ▯ মুজফ্ফর হোসেন ▯ ২৭

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের অঙ্গন তুলসী গাছে ভরা ▯ ৩০

গরিমাটা কোথায়? ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ৩১

ইয়েমেন সঙ্কট : শিয়া-সুন্নির কর্তৃত্ব দখলের লড়াই
▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯

অন্যরকম : ৩৩ ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮** ▯

শব্দরূপ : ৪০ ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভূমিকম্প : ভারত কতটা নিরাপদ

প্রতিবেশী দেশ নেপাল আজ ভয়াবহ ভূমিকম্পের কবলে। নেপালজুড়ে মৃত্যুর মিছিল। কাঠমাণ্ডু শহরটাই যেন নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এই ভূমিকম্পের আঁচ লেগে বারেবারে কেঁপে উঠেছে ভারতের বিভিন্ন অংশ। ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক না হলেও বেশ কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটেছে, ভেঙে পড়েছে কিছু বাড়ি-ঘর। ভূমিকম্পের এই বিধ্বংসী রূপ আতঙ্কিত করে তুলেছে ভারতবাসীকেও। তাই এবারের বিশেষ বিষয়— ভূমিকম্পে ভারত কতটা নিরাপদ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

কেন্দ্র-রাজ্য সুসম্পর্কেই দেশবাসীর লাভ

উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়া নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রতিশ্রুতি যে কথার কথা নহে তাহা আজ মানুষ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিগত সরকারের ন্যায় এই সরকারের গায়ে এখনও কোনো কলঙ্কের কালি লাগে নাই। মূল্যবৃদ্ধির তাপও মানুষকে সহ্য করিতে হইতেছে না। অর্থনৈতিক বিকাশ ঊর্ধ্বমুখী। জাতীয়স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থ অতিক্রম করিয়া ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল চুক্তি সংসদে পাশ করিবার অপেক্ষায় এই সরকার। এইবার দেশের অর্থনীতির ছবি বদলাইতে আমআদমির উন্নয়নের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ঘোষণা করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। গরিব মানুষের জন্য জনধন প্রকল্পে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলিবার মাধ্যমে যে প্রকল্প শুরু হইয়াছিল, জীবন জ্যোতি যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা এবং অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে সেই প্রচেষ্টা দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে। যাঁহারা স্যুট বুটের সরকার বলিয়া এই সরকারকে গালি দিতে তৎপর তাঁহারা হয়তো জানেনই না কেবল ভরতুকি দিয়া গরিব মানুষকে রক্ষা করা যায় না। সাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহাদের সঠিক পথ দেখানোও প্রয়োজন। আর সেই উদ্দেশ্যে দেশের সমগ্র মানুষের নিকট ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছাইবার লক্ষ্যে যে জনধন প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার চালু করিয়াছিল তাহাতে প্রায় ১৫ কোটি নূতন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হইয়াছে এবং সব মিলাইয়া ১৫ হাজার ৮০০ কোটি টাকা সেই অ্যাকাউন্টে জমা পড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার আজ প্রমাণ করিয়া দিতেছে, কথায় কথায় ভরতুকির নামে গরিবকে ভিক্ষা দেওয়া নয় বরঞ্চ মানুষকে স্বয়ম্ভর করিয়া তুলিতে পারিলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে। প্রধানমন্ত্রী এই কারণেই বলিয়াছেন, বিকাশের সুফল গরিব মানুষের ঝুপড়িতে না পৌঁছাইলে বিকাশ সম্ভব নহে।

এখন প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হইলেই কি মানুষের মুখে হাসি ফুটিবে? রাজ্যের ভূমিকা এই ক্ষেত্রে জরুরি। কেন্দ্র রাজ্য কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া উন্নয়নের প্রকল্প লইলে দেশের মানুষের লাভ হইবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসি রাজ্য-সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকাও আশাব্যঞ্জক নহে। মোদীর উন্নয়নের স্বপ্ন যাহাতে সফল হইতে না পারে তাহার জন্য রাজ্যসভায় বাধাদান, রাজ্যে বাধাদান চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে কেবল মেট্রোরেলের উদাহরণ লইলেই বিষয়টি বোধগম্য হইবে। মেট্রোরেলের যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালে লইয়াছিলেন, ইউপিএ আমলে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তৃণমূলদল ইহা লইয়া বহু দরবার করিয়াছে। আজ যখন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে মেট্রোরেলের উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা লইতেছে তখন তৃণমূল সরকার বাধা দিতেছে। এই বাধা কেন? আসলে মেট্রোরেলের সম্প্রসারণ দ্রুত হইলে তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার কৃতিত্ব পাইয়া যাইতে পারে। ২০১৬ -তে বিধানসভা ভোটের পূর্বে তাই মেট্রোরেলের দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হইলেও রাজ্য সরকার আপন স্বার্থে তাহাতে বাধাদান করিবে।

রাজ্যের সুরক্ষা প্রকল্পে আরও অর্থের দাবি করিতেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অথচ চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে রাজস্ব খাতে বর্ধিত অর্থ দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বর্ধিত অর্থ পাইয়াছে। কিন্তু এই রাজ্য সরকার উন্নয়নের পক্ষে নয়, বরঞ্চ দান খয়রাতিতেই বেশি অর্থ বিলাইতে আগ্রহী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানা জনপ্রিয় প্রকল্পের ঘোষণা করিতে সিদ্ধহস্ত, কিন্তু সেই প্রকল্পের বাস্তব রূপদানে তাঁহারা অসমর্থ।

সুভাষিতম্

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনং চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ।। (চাণক্যনীতি)

নিজের দারিদ্র্য, মনের দুঃখ, গৃহের অশান্তি বা কলঙ্ক, নিজের বঞ্চিত হওয়া এবং অপমানের ঘটনা—এগুলি জ্ঞানীব্যক্তিরা অন্যের কাছে কখনো প্রকাশ করেন না।

নেপালের সাম্প্রতিক ভূমিকম্প ও পাকিস্তানের নক্কারজনক ভূমিকা

দেবব্রত ঘোষ ।। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত নেপাল ছিল পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র, আজ সেই নেপাল তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তকমা পাওয়ায় অনেকে আনন্দে আটখানা হয়ে

নেপালে পাঠানো পাকিস্তানের ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে গো-মাংসের প্যাকেট।

উঠেছে। সারা পৃথিবীতে অনেক ইসলাম দেশ রয়েছে, খৃষ্টান দেশও রয়েছে, তাতে কারুর কোনো আপত্তি নেই, আপত্তি শুধুমাত্র হিন্দুরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। তাই নেপাল যখন ভূমিকম্পের ফলে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ, বিপন্ন হয়েছে গোটা নেপালের অর্থনীতি; খাদ্য, পানীয় জল, বাসস্থান, চিকিৎসা ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রেই বিপর্যস্ত নেপালের মানুষ, ঠিক তখন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলো পাকিস্তান ও খৃষ্টান দুনিয়া বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ত্রাণ বা মানব সেবা সেখানে গৌণ, আসল উদ্দেশ্য আর্ত, নিরন্ন বিপন্ন নেপালি জনগণকে তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। ত্রাণের দুই প্রধান উপকরণ হিসেবে হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র নেপালে এসেছে বাইবেল ও গো-মাংস।

ভূমিকম্পের ভয়াবহতায় যখন নেপালে ত্রাহিত্রাহি রব উঠেছে। ভারত তখন সত্যিকার প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব দেখিয়ে সর্বভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। নেপালের সর্বসাধারণ মানুষ এতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। কিন্তু সাহায্যের জন্য পাকিস্তান থেকে গো-মাংসের প্যাকেট আসায় এই দুর্দিনেও নেপালের মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। নেপালে গোবংশকে পূজা করা হয়। গোহত্যা একেবারে নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় ত্রাণসামগ্রীর প্যাকেটে গো-মাংস আসায় স্বাভাবিক ভাবেই লোকের মনে ক্ষোভের উদ্রেক হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে এই খবর ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, সার্ক দেশগুলির কূটনৈতিক সম্পর্কে সঙ্কট উৎপন্ন হতে পারে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীল কৈরালা দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে, নেপালের পরিস্থিতি একটু ভাল হলেই কূটনৈতিকস্তরে বিষয়টি ওঠানো হবে। সূত্রের খবর, পাকিস্তানের পাঠানো ত্রাণসামগ্রীতে নেপালবাসী হাতই লাগাননি।

হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ গো-মাংস ভক্ষণ করেন না। লন্ডনের বিখ্যাত ডেইলি মেল পত্রিকায় ২৯ এপ্রিল এই বিষয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যে, পাকিস্তান থেকে নেপালে খাদ্য হিসেবে প্রচুর পরিমাণে প্যাকেটজাত (Ready to eat) গো-মাংস পাঠানো হয়েছে। আসল উদ্দেশ্য গো-মাংস খাইয়ে হাজার হাজার নেপালিকে ধর্মচ্যুত করা। নয়াদিল্লীর এইমস্ হাসপাতাল ও রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতাল থেকে ৩৪ জন ডাক্তারের এক দল ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই নেপালে গিয়েছিলেন এবং তাঁরাই এটি ধরতে পেরেছেন। নেপালে গো-হত্যার শাস্তি ১২ বছরের কারাদণ্ড। ভারতীয় চিকিৎসকরা মন্তব্য করেছেন যে, নেপালের সাধারণ মানুষ যখন পাকিস্তানের এই কীর্তির কথা জানতে পারবেন তখন তাদের অভিব্যক্তি কি হবে!

নেপালে খৃষ্টান মিশনারিরাও একই খেলা খেলেছে। পরাধীন ভারতবর্ষে খৃষ্টান মিশনারিরা অসংখ্য দরিদ্র হিন্দুদের লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করেছিল, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটা জায়গায় ও মধ্যভারতে, উত্তরপূর্ব ভারতে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। সাদা চামড়ার আদি খৃষ্টানরা কোনোদিনই কালো চামড়ার খৃষ্টানদের একাসনে বসায়নি (বসালে আমেরিকায় নিগ্রোরা অত্যাচারিত হোত না)। ভারতবর্ষেও ধর্মান্তরিত হিন্দুদের তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাদা চামড়াধারী খৃষ্টানদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করতো না। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন ভারতে বৃটিশ শাসকদল তিনটি ব আমদানি করেছে— বাইবেল, ব্র্যান্ডি ও বেয়নেট। স্বামীজীকে সারা জীবন ধরেই ওই খৃষ্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। ভারতের সাধারণ মানুষের অভাব, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তাদের প্রলোভন দেখিয়ে অসংখ্য হিন্দুদের খৃষ্টান করা হয়েছিল পরাধীন দেশে এবং স্বাধীন ভারতেও সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে মিশনারিরা। এই প্রচেষ্টা এখন চলছে নেপালে।

ভূমিকম্প কবলিত নেপালে ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের খৃষ্টানসংস্থা প্রচুর পরিমানে বাইবেল পাঠাচ্ছে নেপালিদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশে। এখানেও লক্ষ্য যদি বিপন্ন হিন্দু নেপালিদের লোকদের এই মওকায় খৃষ্টান করে দেওয়া যায়। নেপালের মানুষ স্বাভিমানের সঙ্গে জানিয়েছে, তারা খাদ্য পানীয় চায়, বাইবেল নয়। এদিকে ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক সহযোগিতাকে নেপালের কমিউনিস্ট নেতা প্রচণ্ড'র কটাক্ষ করাকেও নেপালবাসী ভালো মনে নেয়নি। ▮

সংবাদ প্রতিবেদন

ছিটমহল বাসিন্দারা দেশের নাগরিকত্ব পেতে চলেছে

সংবাদদাতা॥ দুই দিনই সংসদের দুই কক্ষে ওই বিল আনার সাক্ষী থাকতে কাজ ভুলে টিভির সামনে বসেছিলেন দুই দেশের ছিটমহলের বাসিন্দারা। পোয়াতেরকুঠী ছিটমহলের বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন বলেন, ''বিশ্বকাপ ক্রিকেট ম্যাচের চাইতেও দু'দিন হাজারগুণ টানটান উত্তেজনার মধ্যে সবাই টিভির পর্দায় চোখ রাখেন। নাগরিকত্বহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি মিলবে ভাবতেই শিহরিত হচ্ছি।'' প্রবীণ বাসিন্দা মনসুর আলি বলেন, ''আমার জীবদ্দশায় ছিটমহল বিনিময় দেখে যেতে পারব কিনা সংশয় হোত। এ বার মনে হচ্ছে এতদিনের লড়াই বিফলে যায়নি। পঁচাত্তর বছর বয়সে অন্যদের সঙ্গে নাগরিকত্বের

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে ছিটমহলবাসীর কথা তুলে ধরছেন সাধন কুমার পাল।

স্বাদ পাব। এক দারুণ অনুভূতির ব্যাপার!''

সূত্রের খবর, রাজ্যসভার পর লোকসভায় ওই বিলটি গৃহীত হওয়ায় ভারতের ১১১টি ও বাংলাদেশের ৫১টি মিলিয়ে ১৬২টি ছিটমহল দুই দেশের মধ্যে বিনিময় হবে। উভয় দেশের ছিটমহলের ৫১,৪৮৪ জন নাগরিকত্বহীন বাসিন্দা নাগরিকত্ব পাবেন। প্রতিষ্ঠিত হবে আইনের শাসন। ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল নামে একটি সংগঠনের উপদেষ্টা দেবব্রত চাকী মঙ্গলবার বলেছেন, ''যদি বাংলাদেশের ৭ হাজার একর ভূখণ্ডের সঙ্গে ভারতের ৭ হাজার একর ভূখণ্ডের বিনিময় হোত তাহলে খুশি হতাম। যা হচ্ছে তা ৭ হাজারের সঙ্গে ১৭ হাজারের বিনিময়। ওই ক্ষতি স্বীকার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির নীরবতা বিস্ময়ের। ভারতীয়দের কতটা স্বার্থ সুরক্ষিত হয় সেটাই দেখার।''

জি-জিন্দেগী চ্যানেলে পাকিস্তানপন্থী সিরিয়াল দেখানোর কৈফিয়ত তলব করল বিসিসিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ব্রডকাস্ট কনটেন্ট কমপ্লেন কমিটি (বিসিসিসি)-তে সম্প্রতি বহু অভিযোগ জমা পড়ার ভিত্তিতে 'জি জিন্দেগী' চ্যানেলে প্রদর্শিত সিরিয়াল 'ওয়াক্ত নে কিয়া কেয়া হাসিন সিতম' সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেছে তথ্য সম্প্রচার বিভাগ। প্রসঙ্গত অভিযোগ অনুযায়ী, সিরিয়ালটি অত্যন্ত প্ররোচনামূলক এবং দেশভাগকে সম্পূর্ণ পাকিস্তানি দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। বিচারপতি মুকুল মুদগলের অধীনস্থ বিসিসিসি চ্যানেলটিকে নোটিশ জারি করে কারণ দর্শানো ছাড়াও এর কর্তাদেরও তলব করে আগামী ২২ মে শুনানির দিন স্থির করেছেন। সংবাদসূত্র অনুযায়ী আলোচ্য সিরিয়ালটি উপজীব্য দেশভাগের পটভূমিতে রাজিয়া বাট লিখিত একটি প্রেম কাহিনি। পাকিস্তানের অভিনেতা অভিনেত্রীরাই মূলত সিরিয়ালটির তারকা চরিত্রে রয়েছেন। অভিযোগ অনুযায়ী কাহিনিতে ভারতীয় চরিত্রগুলিকে খলনায়কের ভূমিকায় দেখানো হয়েছে। এমন অভিযোগও এসেছে যে সিরিয়ালে শিখ ও হিন্দু চরিত্রগুলি মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। অজস্র মারাত্মক অভিযোগের মধ্যে মুসলিম লিগ ও জিন্নাকে নায়ক বানানো হয়েছে আর কংগ্রেস নাকি তাদের ওপর ভেদমূলক নীতিতে শোষণ চালিয়েছে এমন একটা ধারণা খাড়া করা হয়েছে। আর এরপরই বিসিসিসি চ্যানেল কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করে বসে।

বিদেশে কালোটাকা : লোকসভায় বিল পাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের সম্পদ বিদেশে জমা করার দিন শেষ হতে চললো। কেননা গত ১২ মে কালোটাকার বিরুদ্ধে মজবুত বিল লোকসভায় পাশ হয়। নরেন্দ্র মোদী সরকার গত মার্চ মাসে এই বিল পেশ করেছিল।

এই বিলে একটি ধারা রাখা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বিদেশে কালোটাকা রাখার কথা স্বীকার করে সুদ সহ তুলে নিয়ে সরকারের ঘরে জমা করেন তাহলে তাঁকে রেহাই দেওয়া হবে। নতুবা অপরাধী হিসেবে ৩-১২ বছরের জেলের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি জানান, অপরাধীকে কিছু সময় দেওয়া হবে যাতে তিনি দোষ স্বীকার করেন এবং ৩০ শতাংশ জরিমানা জমা করেন। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলে কালোটাকার মালিককে ৩০ শতাংশ কর, ৯০ থেকে ১২০ শতাংশ জরিমানা এবং জেলের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। বিদেশে জমা রাখা টাকার ওপর আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে ১০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি জরিমানা ধার্য করা হবে।

কংগ্রেস ও বিরোধী নেতারা বিলে শাস্তির উল্লেখ থাকায় আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন যে, এতে নির্দোষ ব্যক্তিরা ঝামেলায় পড়তে পারেন। পরিপ্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, নির্দোষ ব্যক্তির আড়ালে রাঘববোয়ালরা যাতে বাঁচতে না পারে তা দেখা হবে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, লোকসভায় এই বিল পাশ হওয়ায় একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে মোদী সরকার কালোটাকা উদ্ধারে যথেষ্ট সচেষ্ট।

মুসলমানদের পরিকল্পিত হামলার শিকার হিন্দুরা

সংবাদদাতা॥ ফের একবার ইসলামিক হামলার শিকার হিন্দুরা। ঘটনার সূত্রপাত গত ৩ মে। দুপুর নাগাদ একদল হিন্দু কৃষক তীর্থযাত্রী বর্ধমান জেলার জামালপুর বাবাস্থানের উদ্দেশে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন। এরা নদীয়া জেলার জুরানপুর পঞ্চায়েতের নওদা গ্রামের বাসিন্দা। পথে কালিগঞ্জ গ্রামে একটি জায়গায় মুসলমানরা তাঁদের ওপর হামলা চালায়। বিনা প্ররোচনায় তাঁদের ওপর

নদীয়ার কালিগঞ্জ গ্রামে নিহতদের সামনে দাঁড়িয়ে ডা: সুভাষ সরকারের নেতৃত্বে বিজেপির পর্যবেক্ষক দল।

বোমা ছোঁড়া হয়। কোনো ক্রমে পালিয়ে বাঁচেন তাঁরা। পরের দিন অর্থাৎ ৪ মে তাঁরা যখন বাবাস্থান থেকে ফিরে আসেন, পথে ফের ওই একই জায়গায় হামলার শিকার হতে হয় তাঁদের। স্থানীয় একটি মসজিদ থেকে এঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। মুসলমানদের একটি গোষ্ঠী এদের ওপর বোমা ছুঁড়তে থাকে। এই গুলি-বোমার মধ্যে হিন্দু কৃষক তীর্থযাত্রীরা অনেকটা অসহায়ের মধ্যে পড়েন । গুলি-বোমার শব্দ শুনে নিকটবর্তী ছুটিপুর গ্রাম থেকে জনা বারো হিন্দু ছুটে আসেন এঁদের উদ্ধার করতে। কিন্তু এতে বিশেষ কাজ হয়নি। একটি পরিবারের চারজন নিহত হয়েছেন বলে খবর। এছাড়াও বহু মহিলা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, জখমের সংখ্যাও অনেক। গুরুতর আঘাত পেয়ে অনেকে রাস্তায় লুটিয়ে পড়লে তাদেরকে কোপানো হয়। এদের আক্রমণ করেই সন্তুষ্ট থাকেনি মুসলমানরা। এরপর তারা আশপাশের হিন্দু গ্রামগুলিকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে তোলে। অন্তত ৩৫টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করার পাশাপাশি লুঠপাঠ চালানো হয়। মুসলমানদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি বাড়ির গবাদি পশুও। গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি সহ শতাধিক পশুহত্যা করে তারা।

ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তরা। ঘটনার বহু পরে পুলিশ এসে পৌঁছোয়। ঘটনায় গুরুতর আহতদের কাটোয়া সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের ভর্তি নিতে অস্বীকার তো করেই, দুর্ব্যবহারও করে। ফলে বাধ্য হয়ে দু'জনকে নার্সিংহোমে এবং অনেককে বর্ধমান স্টেট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকজনকে কলকাতায় হাসপাতালে ভর্তির নির্দেশ দিলে এদের এস এস কে এম এবং এন আর এসে ভর্তি করানো হয়। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মহম্মদ নাসিরুদ্দিন আহমেদ ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত বিধায়ক। ঘটনার সময় তিনি কালিগঞ্জ থানাতেই সারাক্ষণ বসে থেকে পুলিশকে প্রভাবিত করেছেন, যাতে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা না নেয়। ঘটনায় নাসিরুদ্দিনের সহযোগী ছিল তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আলতাফ হুসেন। এই আলতাফ ও স্থানীয় মসজিদের ইমামের নির্দেশেই ঘটনার পরে ৫ মে পুলিশের ওপর আক্রমণ চালানো হয় বলে অভিযোগ। ওইদিন বিজেপি রাজ্য সহসভাপতি ডাঃ সুভাষ সরকারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আহতদের পরিজনদের সঙ্গে অকুস্থলে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন।

নদীয়ার কালিগঞ্জে হিন্দুদের ওপর হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের মুসলমান সন্ত্রাসের মুখোমুখি হলো নদীয়ার হাঁসখালি এলাকা। গত ৮ মে হাঁসখালি বাজারের ব্যবসায়ী বিমান ঘোষের দোকানে ধাক্কা মারে একটি মালবোঝাই ট্রাক। জানা যায়, ওই ট্রাকের মালিক পাপিয়া মণ্ডল নামে এক মুসলমান মহিলা। পোশাক- ব্যবসায়ী বিমানবাবু যখন তার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন তখন পাপিয়া মণ্ডলের ছেলের সঙ্গে বচসা বাঁধে। তা থেকেই শুরু হয় হাতাহাতি। পাপিয়া মণ্ডলের ছেলে বিমানবাবুর মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করে। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিমানবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পাপিয়া মণ্ডলের সঙ্গে যোগসাজস রয়েছে এলাকার দুষ্কৃতীদের। পুলিশের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ পাপিয়া মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। পরিবর্তে পাপিয়া মণ্ডল পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে যে, বিমান ঘোষ এবং তাঁর ভাই মিলে পাপিয়া মণ্ডলের ছেলেকে অপহরণ করে হত্যা করেছে। এই মিথ্যা গুজবে প্রায় ৪০০ মুসলমান বিমল ঘোষ নিবারণ ঘোষেদের উপর হামলা চালায়, মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে। বিমানবাবুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ফের আঘাত করে। মুহূর্তের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বিমানবাবুর শ্বশুরমশাইও গুরুতর আহত হন। এত অত্যাচারের পরেও পুলিশ নিছক দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। অপরাধীরা এখনও অধরা।

বাংলাদেশে ১৪টি হিন্দু পরিবার গৃহহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ নেতাদের তাণ্ডবে ১৪ হিন্দু পরিবার গৃহহীন হলো। সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী পরিবারগুলি ভিটেমাটি ছেড়ে পথে বসেছে। কার্তিক রায় (৬০), হরেন রায় (৫৫), যাবদ সরকার (৪২), সুভাষ সরকার (৪৪)-রা স্থানীয় যুব লিগ নেতা আব্দুল সালামের তাণ্ডবে গ্রামছাড়া। বরিশালের বরগুনার তালতলি উপজেলার পঞ্চকোড়ালিয়া ইউনিয়নের চন্দনতলা (মগপাড়া) গ্রামে এই সমস্ত হিন্দুদের বাড়ি ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। চরম আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে দিন কাটছে হিন্দুদের। এই ঘটনায় আওয়ামি লীগের যুব শাখার নেতা আব্দুর রশিদ আলমকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এভাবে ১৪টি হিন্দু পরিবারকে গৃহহীন করার ঘটনায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চকোড়ালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কালু পাটোয়ারি বলেন, 'হিন্দু পরিবারগুলি চলে যাওয়ার বিষয়টি কোনোভাবেই মানতে পারছি না। বরগুনা জেলা কমিউনিটি পুলিশের সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা সুখরঞ্জন শীল জানান, '১৯৭১-এর নির্মম অত্যাচারকেও হার মানিয়েছে ঘটনাটি। এই সমস্ত হিন্দুদেরকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনতে হবে। সম্মিলিতভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে।"

বাংলাদেশের বরিশালের তালতলিতে বাস্তুচ্যুত হিন্দু পরিবারের ভিটে।

বাস্তুচ্যুত ভুক্তভোগী যাদব সরকার (৪২) বলেন, ''স্থানীয় মুনসুর আলমের ছেলে আওয়ামি লিগের যুব শাখার স্থানীয় নেতা আব্দুর রশিদ আলম (৪২) প্রায়ই আমাদের কাছে চাঁদা দাবি করত। না দিতে পারলে মেরে ফেলার হুমকি দিত। বাড়ির মেয়েদেরও নানাভাবে উত্ত্যক্ত করত। তিনি আরও জানান, রশিদের রক্তচক্ষুর ভয়ে নির্যাতন আইনে মামলা করি আমরা। এরপরেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং আমাদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় সে। তাই আমরা ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছি।" কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এখনও এদের ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি। এই ঘটনায় স্বভাবতই বাংলাদেশের হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

গত এক বছরে কয়লা চুরি সম্পূর্ণ আটকানো গেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এনডিএ সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে ছত্তিশগড়ের এক সভায় পূর্বতন ইউপিএ সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানালেন নানান ধরনের কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে থাকতে অভ্যস্ত পূর্বতন সরকারের খেয়াল রাখা উচিত তাঁর সরকার প্রথম এক বছরে কোনো ধরনের দুর্নীতিতে কলঙ্কিত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলের কয়লা কেলেঙ্কারির উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সোজা কথায় বললে তখন যোগসাজসে কয়লা চুরি হোত। আপনারা কেউ কি এই সরকারের প্রথম বছরে এই ধরনের কোনো সরকারি চুরির খবর পেয়েছেন? একটি দেশকে কি সততার ভিত্তিতে পরিচালনা করা যায় না? অবশ্যই যায়। একথা আমি আমার এক বছরের অভিজ্ঞতায় জোর দিয়ে বলতে পারি।'

প্রসঙ্গত, মোদীর এই দুর্নীতিমুক্ত সরকার চালানোর ঘোষণার ঠিক আগের দিনই লোকসভায় কংগ্রেস ক্যাগ রিপোর্টকে ঢাল করে পূর্তি গোষ্ঠী ও আই আর ই ডি এ-এর মধ্যে লেনদেনকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করীর ইস্তফা দাবি করেছে। এমনকী লোকসভায় পাশ হওয়া জিএসটি বিলটির ভবিষ্যৎকেও রাজ্যসভায় ঝুলিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। কোনো বিশেষ দলের নাম না করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যাদের মানুষ নির্বাচনে পরিত্যাগ করেছে তারা আজ সরকারের উন্নয়নমুখী কাজের বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়াচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের উদ্দেশে কেবলমাত্র কথার ফুলঝুরি ছড়ানোর অভিযোগ করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী এঁরা গরিবকে চিরকালীন গরিব দেখতে ভালবাসেন। গরিব আমৃত্যু দুঃখ ভোগ করলেই এঁদের সুবিধে। তাদের অবস্থার উন্নতিতে এঁরা দুঃখী হয়ে পড়েন, কংগ্রেসকে তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করে মোদী বলেন, ''যারা দীর্ঘ ৬০ বছরের জয়ের ধারাকেই হজম করতে পারলো না তারা এই বিপুল পরাজয়কে হজম করবে কি করে? কেবলমাত্র মিথ্যে তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করাই এমন এদের কাজ।'

কংগ্রেস আমলে কয়লার খনিগুলি ছেঁড়া কাগজের ভিত্তিতে বা মুখের কথায় বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সরকার স্বচ্ছতা ফিরিয়ে এনে প্রত্যেকটি খনি সর্বোচ্চ দামে নিলাম করে দেশের কোষাগার পূর্ণ করেছে। কয়লা ক্ষেত্রে ময়লাহীন একটি বছর দেশবাসীকে উপহার দিয়েছে।"

কংগ্রেস সরকার দেশের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়নি

ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে দেশের অডিটার অ্যান্ড কম্পট্রোলার জেনারেল। সংক্ষেপে যে সংস্থাকে ক্যাগ বলা হয়। এই ক্যাগের রিপোর্টে টুজি স্পেকট্রাম এবং কয়লার ব্লক বণ্টনে বিস্তর অনিয়ম সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করা হয়েছিল। কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের আমলে এই দুর্নীতি কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের ভিত নড়িয়ে দেয়। দুর্নীতির আতঙ্কে মনমোহন সিং সরকার প্রতিরক্ষা দপ্তরকে সতর্ক করে যে, সেনাবাহিনীর জন্য বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি নীতি বন্ধ রাখতে। নিট ফল, ভারতীয় সেনার মজুত গোলাবারুদে ১০ দিনের বেশি যুদ্ধ লড়া সম্ভব নয়। ক্যাগের সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ৪৩ দিনের গুলিগোলার রসদ রাখে যে কোনো দেশের সেনাবাহিনী। অথচ সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে ১০ দিনের গোলা বারুদের রসদ রয়েছে। কংগ্রেস আসলে অস্ত্রশস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে অনাবশ্যক দীর্ঘসূত্রতা, গোলাগুলি সংগ্রহের ক্ষেত্রে গড়িমসি এবং অফিসারের সংখ্যা কম থাকার জন্যই দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়েছে।

ভারতীয় সেনার গোলা বারুদের অনেকটাই আসে দেশের অর্ডন্যান্স কারখানাগুলি থেকে। কিছুটা বিদেশ থেকে কেনা হয়। সামগ্রিকভাবে দেখভালের দায়িত্বে থাকেন ডিরেক্টর জেনারেল অর্ডন্যান্স সার্ভিসেস বা সংক্ষেপে ডিজিসিও। তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, এখন সেনার হাতে যা গোলা বারুদ রয়েছে তাকে সামরিকভাষায় 'বটম লাইন' বা 'মিনিমাল অ্যাকসেপ্টেড রিসক লেভেল' বলা যায়। ডিজিসিও যুক্তি দিয়েছেন যে, ২০০৯ সালে এর থেকেও

গূঢ় পুরুষের

কলম

অবস্থা খারাপ ছিল। অস্ত্রের মজুত তখন বটম লাইনের অনেক নিচে ছিল। মজুত ৫০ শতাংশ থাকলে ১০ দিনের বেশি যুদ্ধ চালানো যায় না। ২০০৯ সালে গোলা বারুদের মজুত নেমেছিল ১৫ শতাংশে। ফলে বিদেশি আক্রমণের মুখে পড়লে ভারতকে আত্মসমর্পণ করতে হোত। কংগ্রেস দেশের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়নি। অতীতে নেহরুর সরকার দেশের অর্ডন্যান্স কারখানায় অস্ত্রের বদলে লণ্ঠন তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিল। পরিণামে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষে গুলি বারুদ অস্ত্রের অভাবে ভারত পরাজিত হয়। চীন অরুণাচল এবং লাদাখের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে। আজও সেই দখলদারি চলছে।

২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের যে হিসাব ক্যাগ রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে গুলি বারুদের মজুত খুবই কম। এর পিছনে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডের গাফিলতি রয়েছে। তাদের অর্ডার দেওয়া সত্ত্বেও তারা তা সরবরাহ করতে পারেনি। পূর্বতন মনমোহন সিং সরকার ঘোষণা করেছিল যে ২০১২ সালের মধ্যে গোলাগুলির মজুত ৫০ শতাংশ করা হবে। বাস্তবে তা হয়নি। বলা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে ৪০ দিন তীব্র যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় গোলা বারুদের মজুত ২০১৯ সালের মধ্যেই করার। বাস্তব হচ্ছে সেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো যাবে না।

১৯৯৯-এ কারগিল যুদ্ধের পর সেনার সদরদপ্তর ঠিক করে যে, অন্তত ২০ দিন যুদ্ধ করার মতো গোলাগুলি মজুত রাখতেই হবে। কারগিলের যুদ্ধের পর ১৫ বছর কেটে গেলেও সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারিনি। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন বলছে, 'একদিকে পাকিস্তান, অন্যদিকে চীনের মতো প্রতিবেশী, তার সঙ্গে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো রয়েছে কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে জঙ্গিদের তৎপরতা। এই বিশাল দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে ঢাল-তরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দারের মতোই দশা সেনাবাহিনীর।' এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে আক্রমণের হাতিয়ার করতে পারছে না বিরোধী কংগ্রেস দল। কারণ, ক্যাগ রিপোর্টটি ২০০৯-১৯৯৯ সালে কারগিল যুদ্ধের সময় এবং তার পরবর্তীকালে বিজেপি-র নেতৃত্বে এনডিএ সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল। দেশের নিরাপত্তার বিষয়টিকে তখনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দিল্লীতে যখন যে দলের সরকার ক্ষমতায় থাকে তারা জনসাধারণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয় যে ভারত সুরক্ষিত। সব সময় সুরক্ষিত থাকবে। কিন্তু কীভাবে, সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না।

দিদি ধর্ম, দিদি কর্ম, দিদি হি...

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

আপনাদের কাছে অনেক অভিমান নিয়ে চিঠি লিখছি। ইদানীং দেখছি আপনারা দিদির ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না। কিন্তু এমন হওয়ার কি কোনো কারণ আছে? আদৌ কোনো কারণ আছে?

দিদি তো চিরকালই সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে এসেছেন। এবারও তাই করবেন। কিন্তু আপনারা অধৈর্য হয়ে আস্থা রাখছেন না। আমার মনে হয় গরমটা পড়েছে বলেই এই অসহিষ্ণুতা। গরমকালে গরম তো থাকবেই। তা বলে দিদির ওপর আস্থা কমালে চলবে!

পিংলার কারখানায় ছুঁচোবাজি তৈরি হচ্ছিল না হাতবোমা এই সামান্য প্রশ্নের উত্তরও রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারা খুঁজে পাবেন না বলে আপনারা সন্দেহ প্রকাশ করছেন। কিন্তু কেন, দিদির পুলিশের ওপর বিশ্বাস নেই কেন? এর মানে তো দিদিতেই অনাস্থা!

গত চার বছর ধরে তো দেখছেন দিদির সাফল্য, তবু আপনারা ভাবছেন পুলিশ প্রমাণ লোপ করতে যত তৎপর, প্রমাণ খুঁজতে ততটা নয়। আপনারা ভাবছেন অভিযুক্তদের মাথায় যদি কালীঘাটের অভয় হস্ত থাকে, তবে সারদা কাণ্ড, খাগড়াগড় যাই হোক তাতে নাকি পুলিশ প্রমাণ লুকোতে তৎপর হয়ে ওঠে। রাজ্যের সব মানুষই তো আসলে তৃণমূল কংগ্রেস, তাই পিংলাকাণ্ডেও মূল অভিযুক্ত শাসকদলের স্নেহধন্য। এই সহজ সত্যটা কেন যে বুঝতে পারছেন না জানি না। আর সেটা বুঝলেই আপনাদের মনে কোনো সন্দেহ দানা বাঁধবে না। মনে হবে সেখানে কয়েকটি নির্দোষ ফুলঝুরি, ধানিপটকা ছাড়া আর কিছু পুলিশ খুঁজে পাবে না।

আসলে আপনারা পুলিশের ওপর ভরসা হারিয়েছেন ভাবলে ভুল হবে। মনে রাখতে হবে পুলিশ যন্ত্রমাত্র। আসলে আপনাদের ভরসা ঘুচেছে যন্ত্রের যন্ত্রীর উপর। মানে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে আপনারা আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভরসা করছেন না। তাঁকে আপনারা দলনেত্রীই ভাবছেন,

প্রশাসকের ভূমিকায় মানতে পারছেন না। এটা অন্যায়। ঘোর অন্যায়।

তাছাড়া সব বিষয়ে তাঁর থেকে নিরপেক্ষতা প্রত্যাশা করাটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মুখ্যমন্ত্রী সবার ওপরে একজন রাজনীতিক তাই সব প্রশ্নেই তিনি যে রাজনীতি খুঁজবেন, রঙ বিচার করবেন, প্রশাসনিক ক্ষমতার একটু আধটু অপব্যবহার করবেন এতে আর অন্যায়ের কী আছে? এমন এক জনের উপর ভরসা করা চলে না জানি। কিন্তু তাবলে দিদির ওপর বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি! আপনারা কি পাগল না সিপিএম!

কেউ কেউ বলছেন, মানুষ তাঁকে ভরসাই করেছিল। কিন্তু সেই বিশ্বাসের আয়ু বেশি হয়নি। কারণ তা হাওয়ায় বাঁচে না। বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিশ্বাস জনগণের থেকে পেয়েছিলেন তা নাকি নিজেই নষ্ট করেছেন। তাই তো কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে ১১৪টি আসন পেতেই শহর জুড়ে তাণ্ডব চালাতে হয়েছে। আপনাদের জন্যই এটা হয়েছে। আপনারা ভরসা হারিয়েছেন বলেই তো দিদি সিদ্ধান্ত নেন ভোটে জেতার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপনাদের ওপর ভরসা করা ঠিক নয়। আপনারা ভরসা না রাখলে তিনিই বা ভরসা রাখবেন কেন? এরপর যদি আপনাদের উনি মাওবাদী 'তকমা' দিয়ে দেন তখন তো আবার দোষ ধরবেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিক। স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষমতার প্রত্যাশী। অভিজ্ঞতাই তাঁকে শিখিয়েছে, যে কোনো মূল্যে দলীয় পতাকার মাহাত্ম্য বজায় রাখতে হবে, তাহলেই কুর্সি পাকা। নো টেনশন। অতএব, দলের বাহুবলীরা শিল্পক্ষেত্রে তাণ্ডব করবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে আরাবুল ইসলাম-শঙ্কুদেব পণ্ডারা দাপিয়ে বেড়াবেন, আর দিদি চোখ বুজে থাকবেন। বলবেন, ছোট ছোট ছেলের ছোট ছোট ভুল। তাপস পাল, অনুব্রত মণ্ডলরাও ছেলেমানুষ।

মানতে পারলে মানুন। আইন টাইন দেখাবেন না। এ রাজ্যে দিদিই সত্য। দিদিই ধর্ম, দিদিই সঅব।

— **সুন্দর মৌলিক**

নেতাজী-ভীতিই জওহরলালকে নেতাজী পরিবারের ওপর নজরদারি করাতে বাধ্য করেছিল

মণীন্দ্রনাথ সাহা

খবরে প্রকাশ ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকায় ফাঁস হওয়া আই বি রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ নেতাজীর পরিবারের ওপর কড়া নজরদারি চালিয়েছে। ওই সময়সীমার ১৬ বছরই দিল্লীর সিংহাসনে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহরু। কলকাতার এলগিন রোড ও উডবার্ন রোডে দুটি বাড়িতেই এই নজরদারি তথা গুপ্তচরবৃত্তি চালানো হয়েছে। এই তথ্য ফাঁস হওয়ার পর স্বভাবতই নেহরু এবং নেতাজীর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একই রাজনৈতিক অঙ্গনে নেহরু এবং নেতাজী অবস্থান করলেও মানসিক দিক দিয়ে এবং আন্দোলনের মত ও পথের পার্থক্যের জন্য দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ ছিল। তার ফলে নেহরুর চেয়ে নেতাজীর রাজনৈতিক উচ্চতা অনেক বেশি ছিল বলেই মনে করতেন আপামর ভারতবাসী। সেটা নেহরু ভালভাবেই জানতেন। নেহরু এবং গান্ধীজী উভয়েই আরও জানতেন যে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি। নেহরুর মনে আরও আশঙ্কা ছিল যে, যে কোনো সময় নেতাজী ভারতে ফিরে আসতে পারেন। যদি তিনি ফিরে আসেন তাহলে নেহরুর দিল্লীর গদি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। সম্ভবত সেই ভয়ে ভীত হয়েই তিনি ওই নজরদারির ব্যবস্থা করেছিলেন।

নেতাজী যে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পরেও বেঁচে ছিলেন তার বহু প্রমাণের মধ্যে থেকে আমি মাত্র কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

> “ইতিহাসকে সমূলে বিনষ্ট করার এক অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেছেন এদেশের রাজনৈতিক কর্তারা। বর্তমানে মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দায়িত্ব পালন করে চলেছে। আশা করা যায় এই সরকার উদার মনোভাব ও যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের জট খোলার জন্য উদ্যোগী হবে।”

১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট ফরমোজার (বর্তমান তাইওয়ান) তাইহোকু বিমানবন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর খবর দেশবাসী বিশ্বাস করেননি। এমনকী মহাত্মা গান্ধী এবং নেতাজীর দাদা সুরেশচন্দ্র বসুও ওই খবর মেনে নেননি। বৃটিশ সরকারও মনে করতেন, বৃটিশ গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিতেই নেতাজীর এই পরিকল্পনা। শুধু বৃটিশ গোয়েন্দারাই নয়, আমেরিকার তুখোড় গোয়েন্দাবাহিনীও সেকথা মনে করত। যেমন মার্কিন গোয়েন্দার বক্তব্য— "The Government and people of USA do not belive the so called death of Chandra Bose in that reported Plane crash. Moreover, some people have seen him after the incident including a field nurse. There is every posibility that Bose is alive." (National Republic : Sept., 1956).

অর্থাৎ মার্কিন সরকার ও সেখানকার জনসাধারণ কেউ বিশ্বাস করে না যে, তথাকথিত ওই বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র বোসের মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তীকালে জনৈক ফিল্ড নার্স এবং আরও কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে দেখেছেন।

নেহরু ও গান্ধীজী জানতেন যে, নেতাজী রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। আর তাই জওহরলাল নেহরু ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে আই এন এ ডিফেন্স কাউন্সিলের স্টেনোগ্রাফার শ্যামলাল জৈনকে দিয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলিকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা হয়েছিল, "আপনাদের যুদ্ধাপরাধী সুভাষচন্দ্র বসু রাশিয়ায় রয়েছেন। স্ট্যালিন সুভাষকে আশ্রয় দিয়েছেন। যুদ্ধাপরাধী সুভাষকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

১৯৪৬ সালের ২২ জুলাই গান্ধীজীর সচিব মুরশিদ নৌরজি চিঠি লিখে তৎকালীন বৃটিশ সাংবাদিক লুই ফিশারকে জানান, "বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যরা নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি সহানুভূতিশীল। নেতাজী যদি রাশিয়ার সৈন্য নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন, তাহলে গান্ধীজী বা কংগ্রেস ভারতকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন না।" ওই সঙ্গে গান্ধীজীও আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে লেখেন, "সুভাষচন্দ্রের ফিরে আসার আগেই ভারত ভাগ করে বৃটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব তাঁর মেনে নেওয়া উচিত।"

১৯৫৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর তৈরি করা শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্ট সরকার মেনে নিলেও জনগণ তা মেনে নেননি। তাই আবার ১৯৭০-এ (৭০-৭৪) বিচারপতি খোসলার নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করে কেন্দ্র সরকার। জনগণ এই কমিটির রিপোর্টেও বিশ্বাস রাখতে পারেননি।

নেতাজী যে রাশিয়ায় আছেন সেকথা অনেকের মতো নেহরুর বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও জানতেন। তিনি রাশিয়ায় ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন নেতাজীর সেখানে অবস্থানের কথা জানতে পারেন। তিনি মুম্বইয়ে বিমান থেকে নেমেই মন্তব্য করেছিলেন, রাশিয়া থেকে তিনি এমন এক খবর নিয়ে ফিরেছেন যে, ভারতবাসী তা জানলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হবেন। বলেছিলেন, 'The whole country will be electrified.'

১৯৫৫ সালে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর প্রথম পদক্ষেপ ছিল ক্রুশ্চেভের আমন্ত্রণে নেহরুর সোভিয়েত দেশে যাওয়া ও সোভিয়েত নেতাদের ভারত প্রদর্শন। ১৯৫৬ সালে আয়োজিত হলো সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিখ্যাত বিংশতিতম কংগ্রেস, যে কংগ্রেস উপলক্ষে লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক থেকে বারবার সংবাদমাধ্যমে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল যে, সুভাষচন্দ্র বসু রাশিয়ায়। অবশেষে এই ১৯৫৬ সালেই শাহনওয়াজ কমিটি রায় দিল— নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মৃত।

দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনও রাশিয়ায় গিয়ে সেখানে নেতাজীর উপস্থিতির কথা জানতে পারেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যাপনার সময় রাধাকৃষ্ণানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ড. সরোজ রায়। রাশিয়ায় নেতাজীর অবস্থানের কথা রাধাকৃষ্ণান তাঁকে জানিয়েছিলেন। বন্ধু সরোজ রায়ের কাছে এই গোপন খবর পেয়ে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে। মোরারজী দেশাই সঙ্গত কারণেই শাহনওয়াজ কমিটি এবং খোসলা কমিশনের মনগড়া রিপোর্ট বাতিল করে দিয়েছিলেন। (সূত্র : Country must know what happened to Netaji, Samar Guha. P-13).

১৯৯৯ সালে এনডিএ সরকারের আমলে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনোজ কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণের সঙ্গে আরও একটি প্রমাণ তিনি পেয়েছিলেন। তা হলো ২০০৩ সালে তাইওয়ান সরকার মুখার্জী কমিশনকে সরাসরি জানিয়েছে, বিমান বন্দরের রেকর্ড অনুযায়ী তাইহোকুতে ওইদিন কোনো বিমান দুর্ঘটনাই হয়নি। ফলে সেখানে নেতাজীর মৃত্যুর তত্ত্ব বাতিল করে দেয়। জনগণ এ রিপোর্ট মেনে নেয় কিন্তু ইউপিএ সরকার সংসদে কোনো কারণ না দেখিয়েই ওই রিপোর্ট খারিজ করে দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এক প্রখ্যাত অধ্যাপক কমিশন্ড অফিসার হিসেবে বৃটিশ বাহিনীতে যোগ দেন। 'The Last Day's of British India' নামে তাঁর লেখা বইটির শেষে তিনি লিখেছেন, ''The Ghost of Subhash which was confined to redfort after redfort trial all of a Sudden magnified itself to a devastating shape and size roomed allover the conference which ultimately led to the freedon of India.'' এই কনফারেন্সে পাকিস্তান সৃষ্টিকারী মহম্মদ আলি জিন্না শুধু বলতেন, 'hurry up for creation of India and Pakistan.' তিনি আরও বলতেন, if Subhash comes, my deram of Pakistan will be gone.' কারণ জিন্না সাহেব জানতেন যে সুভাষচন্দ্র বসু কখনই ভারতকে ভাগ করতে দিবেন না। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন সুভাষ বেঁচে আছেন।

বাঙালি সাংবাদিক দেবজ্যোতি বর্মন তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৯৭২ এর ১৫ এপ্রিল 'এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে যে তথ্য দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে— 'ভিয়েতনামের এই লড়াইয়ের পেছনে এক মহাসত্য লুকিয়ে আছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পেছনে ছিল সেই একই সত্য। সে কথাটা বলতেই বাংলাদেশে অতি সম্প্রতি ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। সে কথাটা এই যে, একই শক্তি এই দুই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে ক্রিয়াশীল; প্রেরণার উৎসমূল উভয়ক্ষেত্রেই এক। রণনীতি পরিচালনা করেছেন উভয়ক্ষেত্রেই একই রণগুরু। আগামী দিনে তাঁরই বিজয়পতাকা এশিয়ার দিকে দিকে উড্ডীন হবে।'

বাংলাদেশের যুদ্ধে আজাদহিন্দ ফৌজের এক ডিভিসন সৈন্য যুদ্ধ করেছেন। এঁরা ভিয়েতনাম থেকে এসেছিলেন। এঁদের বুকে আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাজ লাগানো ছিল। ১৯৭২-এ কলকাতায় মুজিবুর রহমানকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তখন এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মুজিব সাহেব বলেন, বাংলাদেশ যে স্বাধীন হয়েছে, এটাই প্রমাণ করে যে নেতাজী জীবিত।

মনে রাখতে হবে, কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং কোনো দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হওয়ার যে তত্ত্ব বাজারে ছাড়া হয়েছে তা বর্তমান ভারতের ক্ষেত্রে কোনো আশঙ্কার কারণ আছে বলে মনে হয় না।

ইতিহাসকে সমূলে বিনষ্ট করার এক অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেছেন এদেশের রাজনৈতিক কর্তারা। বর্তমানে মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দায়িত্ব পালন করে চলেছে। আশা করা যায় এই সরকার উদার মনোভাব ও যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের জট খোলার জন্য উদ্যোগী হবে।

নেতাজীর জীবন বৃত্তান্ত ইতিহাসের এক অমূল্য অধ্যায়। সেটিকে সত্যের আলোয় আলোকিত হতে না দেওয়ার পাপ যেন দেশের বর্তমান রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ললাটে কলঙ্কের কালিমা হিসাবে শোভা না পায়। ■

রাসবিহারী বসু : সুভাষচন্দ্র
এক বৈপ্লবিক সম্পর্ক

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের লুকোচুরি খেলা নিয়ে শোরগোল উঠেছে। কথায় আছে শেষ হয়েও হলো না শেষ। কিন্তু নেতাজী সুভাষের চাঞ্চল্যকর কীর্তি কাহিনির মূলে অপর যে বিপ্লবী পথ প্রস্তুত করেছিলেন তিনি মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু। ইতিহাসের নিরিখে দেশনায়ক নেতাজী সুভাষ এবং মহাবিপ্লবী রাসবিহারী একে অন্যের পরিপূরক। তবে একটা বড় পার্থক্য রয়েছে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ-নেতা আর অন্যদিকে রাসবিহারী সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধের মহানায়ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া যে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল তার উদ্যোক্তা ছিলেন রাসবিহারী বসু। তিনি ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লববাদের মূর্ত প্রতীক। তিনিই জাতীয় বিপ্লববাদকে আঞ্চলিক বৃত্ত থেকে প্রথমে জাতীয় পরিসরে ও শেষে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রসারিত করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে তাঁর পথ পরিক্রমা শুরু হয় আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাসবিহারী সমগ্র ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন। যুদ্ধের টালমাটাল সময়ে তিনি মহানিষ্ক্রমণের রোমাঞ্চকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ঠিক একশো বছর আগে ১৯১৫ সালের ১২ মে কলকাতার খিদিরপুর জাহাজ ঘাট থেকে জাপানি জাহাজ 'সানুকিমারু'র অন্যতম যাত্রী ছিলেন পি. এন. ঠাকুর আর সেই জাহাজেই অন্যতম যাত্রী ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। আসলে রবীন্দ্রনাথ যাত্রী, তাঁর সহযাত্রী সেজে রাসবিহারী জাপানে পাড়ি দিলেন।

কিন্তু কেন ভারত থেকে ছদ্মবেশে রাসবিহারী চলে গেলেন? এর মূলে ছিল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সংগ্রামী রণকৌশলের বিন্যাস। বিচ্ছিন্ন ভাবে চোরাগোপ্তা পথে বিপ্লববাদ কার্যকর হবে না। এই উপলব্ধি থেকে রাসবিহারী

পি এন ঠাকুর ছদ্মবেশে
রাসবিহারী বসু

বসু (১৮৮৬-১৯৪৫ খৃ.) দেশব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধের পরিকল্পনা নেন। বোধ করি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের স্মৃতি রাসবিহারীকে প্রভাবিত করেছিল। মহাযুদ্ধের চাপে ভারত থেকে বেশিরভাগ সৈন্যকে রণাঙ্গনে নিয়োজিত করা হয়। তাই দেশীয় সেনাদের নিয়ে অভ্যুত্থানের সময় উপস্থিত। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে বিখ্যাত বিপ্লবী সংস্থা গদর পার্টির লোকজন দেশে ফিরে এসেছেন। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব সর্বত্র আসন্ন সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুতি শুরু হলো। রাসবিহারী ছিলেন মূল কর্ণধার, তাঁর সহযোগী হলেন পাঞ্জাবের কর্তার সিং, বেনারসের শচীন সান্যাল ও মহারাষ্ট্রের বিষ্ণু পিংলে। ঠিক হলো ১৯১৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিভিন্ন সেনা ব্যারাকে বিদ্রোহ শুরু হওয়ার দিন সংঘর্ষের তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারির বদলে ১৯ ফেব্রুয়ারি এগিয়ে আনা হলো। কিন্তু বিপ্লবের কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বিদ্রোহের পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। এই অবস্থায় রাসবিহারী এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে বৃটিশের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে বিদেশে গিয়ে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করার। তাই তিনি জাপানে পাড়ি দিলেন। ১৯১৫ সালের জুন মাসের গোড়াতে জাপানে এলেন। চীনের বিপ্লবী-নেতা সান ইয়াৎ সেন-এর সঙ্গে পরিচিত হলেন। জাপানে প্রবাস জীবনের প্রথম দিকে ১৯১৫ সালের ২৭ নভেম্বর রাসবিহারী, হেরম্ব গুপ্ত ও ভারতের অন্যতম বরেণ্য নেতা লালা লাজপত রায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য এক সভার আয়োজন করেন। এরপর বৃটিশ সরকারের চাপে লালাজী আমেরিকা চলে যান। পরে হেরম্বও আমেরিকায় হাজির হন। রাসবিহারী ছদ্মবেশে আত্মগোপন করেন। এক জাপানি ব্যবসায়ী আইমো সোমা তাঁকে গোপন ডেরায় আশ্রয় দেন। এরপর রাসবিহারী আইমো সোমার কন্যা তোশিকোর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর জাপান থেকেই রাসবিহারী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৪ সালে জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ ও ১৯২৭ সালে প্যান এশিয়ান সমিতি স্থাপন করেন। এছাড়া নিউ এশিয়া ও এশিয়ান রিভিউ পত্রিকা প্রকাশ করেন।

সুভাষচন্দ্রকে রাসবিহারীর ঐতিহাসিক পত্র :

দূরদর্শী রাসবিহারী বুঝেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এশিয়ায় আগত প্রায়। এই সময়েই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শাসন ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় আগেই রাসবিহারী উদ্যোগী হন। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরেই ২৫ জানুয়ারি রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে একটি চিঠি লিখে কংগ্রেসকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান। রাসবিহারী খোলাখুলি লিখলেন জাতীয় কংগ্রেস এখন সংগ্রাম বিমুখ নিয়মতান্ত্রিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে, তাই কংগ্রেসের পক্ষে কোনোমতেই বৃটিশ শাসনের শৃঙ্খল মোচন সম্ভব নয়। এরজন্য কংগ্রেসকে একটি প্রকৃত সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা প্রয়োজন। অহিংস আন্দোলনের ফাঁকাবুলি প্রতারণার সামিল (The fetish of non-violence should be discarded and the creed should be changed. Let us attain our goal through all possible means-violence or non-violence)। রাসবিহারী আরও জানালেন কংগ্রেসকে একটি সার্বিক বিশ্বজনীন মনোভাব গ্রহণ করতে হবে

এবং বৃটেনের শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। দীর্ঘপত্রের শেষে রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন যত সমালোচনার ঝড় উঠুক না কেন অবিচল চিত্তে ভারতকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে হবে। সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য কংগ্রেসকে সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে। ভারতবাসীর সমরশক্তির অধিকার অর্জন করা প্রয়োজন। রাসবিহারী তাঁর পত্রে হিন্দুমহাসভা নেতা বি.এস. মুঞ্জের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন, কেননা মুঞ্জেই ভারতবাসীর সমর-শিক্ষার জন্য একটি সামরিক স্কুল খুলেছেন। রাসবিহারী তাঁর পত্রে ভারতবাসীর সংহতির জন্য হিন্দু সমাজের সংহতির প্রয়োজনীয়তার কথা লেখেন। রাসবিহারী সকল ভারতবাসীকেই হিন্দু জাতিভুক্ত বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায় "The Muslims are Hindus too, when they are born in India and when their religious practices differ from those of the muslims of Turkey, persia, Afghanistan etc." এখনকার সুযোগসন্ধানী মেকি সেকুলার রাজনীতিবিদ ধর্মীয় বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে দেশের ঐক্য ও সংহতিকে দুর্বল করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

দুঃখের কথা, রাসবিহারীর চিঠি সুভাষচন্দ্রের হাতে এসে পৌঁছয়নি। কারণ বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ তা বাজেয়াপ্ত করে নেয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সুভাষচন্দ্র বছর খানেকের মধ্যে কংগ্রেস সংগঠন প্রায় নিজ আয়ত্তে এনেছিলেন। কিন্তু গান্ধীপন্থীরা, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ও কমিউনিস্ট পার্টি সকলেই সুভাষচন্দ্রের বিপক্ষে চলে যায়।

আপোসহীন সংগ্রামের প্রতিমূর্তি সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের নিস্পৃহতা ও দোদুল্যমানতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল ফরওয়ার্ড ব্লক কাগজে সম্পাদকীয়তে হুঙ্কার ছুঁড়লেন। তাঁর ভাষায়— "The bugle has been sounded. The die has been cast. Let nobody falter at this hour. We have to leap ahead and ever ahead."

কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস-শীর্ষনেতৃত্বের নিরাসক্ত মনোভাব ও সুভাষ-বিরোধী অবস্থানের ফলে সুভাষচন্দ্র কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। অবশ্য তিনি সাভারকর প্রমুখ নেতাদের কাছে অভয়বার্তা পেলেন। অন্যদিকে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু দেশবাসীকে আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানালেন। তিনি শুধু দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাপানের হাতে ধৃত ভারতীয় সেনাদের নয়, ভারতের ভেতরে ভারতীয় সেনানীদের ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মতো ভারতজুড়ে অভ্যুত্থানের আবেদন জানালেন। তাঁদের দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বললেন। ভারতীয় পুলিশ ও অফিসারদের বৃটিশ সরকারের নির্দেশ উপেক্ষা করতে বললেন। রাসবিহারীর ভাষায় আমাদের লক্ষ্য তিনটি— "একটি দেশ— ভারত, একটি শত্রু— বৃটেন এবং একটি ব্রত— স্বাধীনতা।"

একদিকে দেশের ভেতরে অভ্যুত্থানের ডাক দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ জুন ব্যাঙ্ককে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠিত হলো এবং এই সঙ্ঘ ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বা আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। রাসবিহারী বুঝেছিলেন ভারতের ভেতরে গণঅভ্যুত্থান শুরু হলে আর বাইরে থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনী অভিযান চালালে বৃটিশ শাসনের সৌধ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

রাসবিহারী যখন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সেনা ও প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও বিকল্প সরকারের কাজ শুরু করে দিয়েছেন, সেই সময়েই সুভাষচন্দ্র ভারত থেকে অন্তর্ধান করলেন এবং ইউরোপে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের রণকৌশল তৈরি করলেন। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মুক্তিযুদ্ধ সম্ভব একথা উপলব্ধি করে সুভাষচন্দ্র রাসবিহারীর আহ্বানে এক সাবমেরিনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জার্মানি থেকে পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছলেন। এরপর ১৯৪৩ সালের ২ জুলাই রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের দায়িত্বভার নিলেন। এরপর সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হলেন। দেশনায়ক থেকে এখন সুভাষচন্দ্র সামরিক বেশে সজ্জিত নেতাজী। পরিশেষে ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর অস্থায়ী স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। নেতাজীকেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন ভারত সরকারের রাষ্ট্রনায়ক ও প্রধানমন্ত্রী বলা যেতে পারে। মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আপোস ও গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতায় বসেননি।

নেতাজী : রাসবিহারীর উত্তরসাধক :

সুতরাং ঐতিহাসিক দিক থেকে নেতাজী সুভাষ ছিলেন রাসবিহারী বসুর উত্তরসাধক। ১৯১৫ থেকে আমৃত্যু (২১ জানুয়ারি ১৯৪৫)

তিন দশক ধরে রাসবিহারী প্রবাসে ভারতীয় বিপ্লববাদের শিখা প্রজ্বলিত রেখেছিলেন। আর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ সুভাষচন্দ্রের হাতে অর্পণ করে বাইরে থেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধকে আরও গতিশীল ও কর্মচঞ্চল করার পথ প্রশস্ত করলেন।

রাসবিহারীর মতোই সুভাষচন্দ্র মনে করেছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং বৃটিশ শাসনের সমাপ্তি ঘটবে। নেতাজীর ভাষায়, "when the British Government is thus attacked from both sides– from outside and from inside it will collapse and the Indian people will then regain liberty."

দুঃখের বিষয়, স্বাধীন ভারতে নেতাজীকে নিয়ে নেহরু ও কংগ্রেস সরকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে নেতাজীর মহান অবদানকে কলুষিত করার চেষ্টা করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান কর্ণধার মাউন্টব্যাটেন ও ভারতের হবু প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সখ্য অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু মনে হয়েছে। আর আজাদ হিন্দ বাহিনীর পূর্বতন সেনানীদের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে নেওয়া হয়নি, কারণ তাঁরা বিশ্বাসঘাতক, মুক্তি সেনানী নয়। আর ১৯৪৯ সালে ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল কোনো সামরিক বিভাগের অফিসে নেতাজীর আলোকচিত্র লাগানো যাবে না। ভেবে দেখুন, নেহরু কতটাই নেতাজীকে প্রাণে ডরাতো। ভণ্ডামি, কপটতার মুখোশ পরে 'সত্যমেব জয়তে'-কে সংহার করা এক নির্লজ্জ অপরাধ।

(লেখক পশ্চিমবঙ্গ স্টেট আর্কাইভস্-এর অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা)

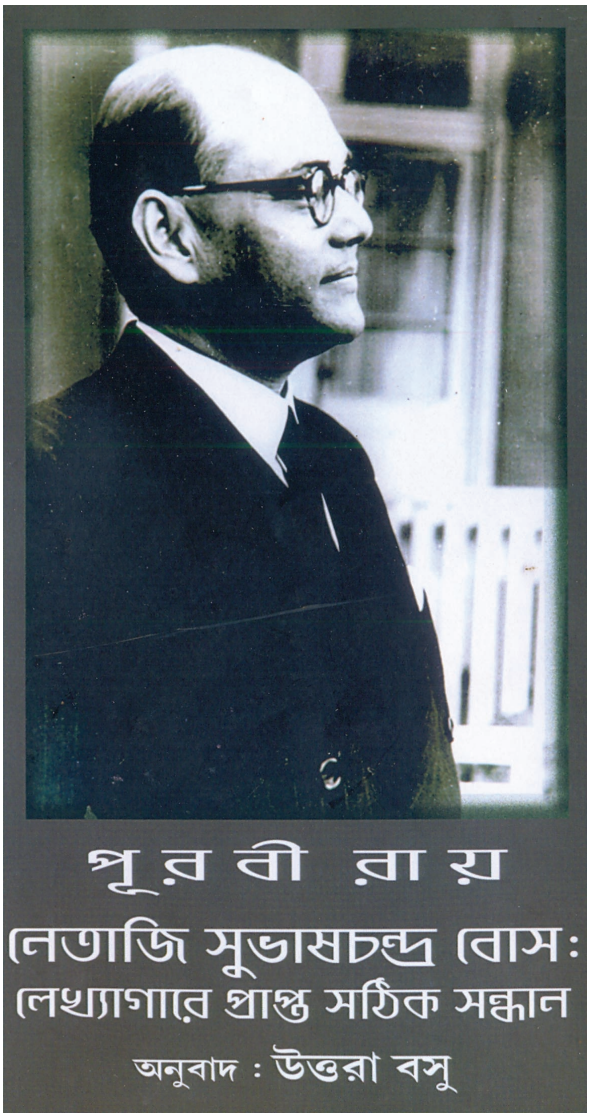

নেতাজী অন্তর্ধান রহস্যে কংগ্রেসের দোসর কমিউনিস্টরাও : পূরবী রায়

সারথি মিত্র

নেতাজী সংক্রান্ত গোপন ফাইল প্রকাশ্যে আসার ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী নেতাজী-গবেষিকা পূরবী রায়। তিনি মনে করেন নেতাজী'র অন্তর্ধানের পেছনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সমানভাবে দায়ী। সুতরাং নেতাজী-র অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচন হোক এরা কোনোদিনই চাইবে না। নেতাজী নিয়ে সাম্প্রতিক হইচইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষিকা রায় 'স্বস্তিকা'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানালেন : 'নেতাজী'র অন্তর্ধান নিয়ে প্রথম দিশা দেখিয়েছিল অটলবিহারী বাজপেয়ীর এনডিএ সরকার, ১৯৯৯ সালে। যে বছর তারা বিচারপতি মনোজ কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মুখার্জি কমিশন গড়েছিল নেতাজী অন্তর্ধানের রহস্য উন্মোচনে। ইতিপূর্বে ১৯৫৬ সালে শাহনওয়াজ কমিটি এবং ১৯৭২ সালে গঠিত খোসলা কমিশন দুটিই তাঁর রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে সঠিক তথ্যভিত্তিক যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ দিতে পারেনি। তাই এন ডি এ সরকার যখন মুখার্জি কমিশন গড়েছিল, তখন তাতে ঝুঁকি ছিল যথেষ্ট। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলো যে, মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এল ২০০৫ সালে। সেই সময় প্রথম ইউপিএ জমানা শুরু হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধ-মত বলে তারা এই রিপোর্ট মেনে নিল না। এ টি আর (অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট)-ও মানতে চাইল না। ইউপিএ তাদের দু'টি মেয়াদেই বিষয়টি নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেনি। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসায় এখন মনে হয় সত্য আস্তাকুঁড় থেকে উঁকি দিচ্ছে। তবে হঠাৎ করে তাঁরা কিছু করার ঝুঁকি নেবেন বলে মনে হয় না। তাহলে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাবে। এইসব গোপনীয় ফাইল উদ্‌ঘাটনের জন্য আমার মত হলো একটি নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করা। তাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষজন থাকবেন। যেমন লেখ্যাগারের মানুষেরা থাকবেন, তেমনি বিজ্ঞানী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মানুষজন, ইতিহাসবিদেরা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের লোকেরাও থাকবেন।'

২০১১ সালে শ্রীমতী রায়ের 'The Search for Netaji : New Findings' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকেই তাঁকে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস উভয়ের পক্ষেরই বইয়ের সারবস্তু মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। রাশিয়ান ফেডারেশনের বিভিন্ন লেখ্যাগারে সংরক্ষিত অসংখ্য দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটাঘাঁটি করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। সেই সুবাদে তিনি মনে করেছেন ১৯৪৫ থেকে অন্তত ১৯৫৬ পর্যন্ত নেতাজী রাশিয়াতেই ছিলেন। এবং তাঁর অন্তিমকাল সেখানেই কাটে। স্বাধীনোত্তর ভারতে নেতাজীকে নিয়ে কম গুজব রটেনি। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে নেতাজী-র অন্তর্ধান অনুসন্ধানের যে চরম অভাব ছিল, পূরবী রায়ের বইটি তা পূরণ করল। কিন্তু কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের কায়েমি স্বার্থে তা আঘাত দিল। প্রথমত, এই বইটি প্রমাণ করল ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকু-তে বিমান দুর্ঘটনার কথা সম্পূর্ণ বানানো। এতে কংগ্রেসের ক্ষিপ্ত হবার যথেষ্ট কারণ রইল। অন্যদিকে রাশিয়া-নেতাজী সম্পর্ক এদেশের কমিউনিস্টদেরও অস্বস্তিতে ফেলল। পূরবী রায়ের বক্তব্য : 'শুধুমাত্র কংগ্রেসকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কমিউনিস্টরাও সমানভাবে দোষী। কংগ্রেস যেখানে নেতাজী অন্তর্ধানের পেছনে নেহরু সংযোগের ছায়ায় বিষয়টি চাপা দিতে মরিয়া, সেখানে কি এটা খুব কৌতূহলজনক নয় যে কমিউনিস্টরা কেন একবারের জন্যও দাবি করল না যে নেতাজী সম্পর্কে যাবতীয় সত্য উদ্‌ঘাটিত হোক? আমার মনে হয়েছে স্ট্যালিন নিশ্চিত ছিলেন না নেতাজী ভারতবর্ষে ফিরে এলে নেহরু আর তার দোসর কমিউনিস্টরা তাঁকে কীভাবে স্বাগত জানাবে। ১৯৫১ সালে

মস্কোতে একটি বৈঠকে তিনি বিষয়টি নিয়ে সিপিআই নেতা শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। পরে ডাঙ্গে এই আলোচনার বিস্তারিত বর্ণনা দেন তাঁর কন্যা শাইলাজা-কে যিনি মস্কোয় থাকতেন।' নেতাজী নিয়ে গবেষণার সময় অধ্যাপিকা পূরবী রায় বহুবার ডাঙ্গে-কন্যার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রসঙ্গত, পরে বইটির বঙ্গানুবাদ (উত্তরা বসু কৃত)-ও বেরোয় : 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস : লেখ্যাগার প্রাপ্ত সঠিক সন্ধান' (২০১৪)।

তিনি মনে করেন যে, স্ট্যালিন খুব ভালোভাবেই জানতেন যে কংগ্রেসকে ছাড়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি চলতে পারছে না। ১৯৫১ সালে কমিউনিস্টদের ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যা অরুণা আসফ আলি স্ট্যালিনকে জানিয়েছিলেন যে, নেহরু ছাড়া ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব মেরুদণ্ড নেই। ১৯৫১ সালেই সর্বভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা চিত্ত বসু সোভিয়েত মিলিটারি আর্কাইভ থেকে নেতাজী-র বিষয়ে একটি ফাইল পান। চিত্তবাবুর তার কয়েকমাস পরে রাজধানী এক্সপ্রেসে ভ্রমণের সময় রহস্যময় মৃত্যুর পরে তাঁর ফাইলটিও রহস্যময়ভাবে চিরতরে হারিয়ে যায়। এমনটাই জানালেন নেতাজী গবেষিকা পূরবী রায়। তাঁর বক্তব্য : '১৯৫৩-র মার্চে স্ট্যালিনের প্রয়াণের পর নেহরু সুভাষচন্দ্র বিরোধী চক্রান্তে নতুন জোর পান। ১৯৫৬-এর ফেব্রুয়ারিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশ্চেভের গোপন ভাষণ যা শুধুমাত্র স্ট্যালিনের ব্যক্তিত্ব ও একনায়কতন্ত্রের অভিযোগের কারণেই সোভিয়েত রাজনীতিতে বিতর্কের ঝড় তোলেনি, নেতাজী পথের দিশা দেখাতেও এই কংগ্রেস স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কাকতালীয়-র থেকেও বড়ো ঘটনা যে ঠিক ওই বছরই নেহরু নেতাজী অন্তর্ধান রহস্যের সমাধানে শাহনওয়াজ কমিটি গড়েন।' তিনি আরও বলেন : 'নেতাজী সংক্রান্ত কেজিবি ফাইলগুলি প্রকাশ্যে আসার জন্য অনেক এতাবৎ অপ্রকাশিত সত্য উদ্‌ঘাটিত ইয়েছে। সাইবেরিয়ান শহর ওমস্ক কিংবা পেরেডিলকিনো যেখানে প্রত্যেকে এমনকী ড. জিভাগো, লেখক বরিস পাসটেরনাকের সঙ্গে কড়া নজরদারির মধ্যে ছিলেন নেতাজী। যদি ভারত সরকার রাশিয়াকে এখন প্রস্তাব দেয় তাহলে খুব ভালো একটা সম্ভাবনা আছে, সোভিয়েত-পূর্ব রাশিয়ার অসংহতির সত্য প্রকাশ্যে আসার। যেটা ইতিপূর্বে অস্বীকার করা হয়েছিল।'

পূরবী রায় মনে করেন, নরেন্দ্র মোদী সরকারের উচিত রাশিয়ার বর্তমান ভ্লাদিমির পুতিন সরকারের ওপর চাপ দেওয়া যাতে তাঁরা এই সত্যটা মেনে নেয় যে নেতাজী-র অন্তিমদশা রাশিয়াতেই হয়েছিল। একথা আমাদের জানা যে, নেতাজী যোসেফ স্ট্যালিনকে দু'টি চিঠি লিখেছিলেন বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁকে সহায়তা করার জন্য। একটি লেখেন ১৯৪১-এ, অপরটি ১৯৪৩-এ। কলকাতায় গৃহবন্দী অবস্থা থেকে নেতাজীর পলায়নের পর রাশিয়ার ভেতর দিয়ে জার্মানিতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে স্ট্যালিনের সহায়তা তিনি পেয়েছিলেন। শ্রীমতী রায়ের মতে, নেতাজী রহস্যের জট খুলতে ভারত সরকারের উচিত জাপান সরকারের ওপরও চাপ সৃষ্টি করা। কারণ পূর্বাপর অভিজ্ঞতা বলছে, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে নেতাজীর অন্তর্ধান সংক্রান্ত সৎ-উদ্দেশ্যে গড়া একমাত্র কমিশন—মুখার্জি কমিশন জাপান সফরে যাওয়ায় অন্তর্ধান রহস্যের জট অনেকটাই খুলেছিল। জাপানের রেনকোজি মন্দিরে রাখা নেতাজীর চিতাভস্ম বলে কথিত বস্তুটির সত্যতা যাচাইয়ে মুখার্জি কমিশন তার ডি এন এ যাচাই করতে চাইলে তাঁদের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারলে নেতাজী-রহস্যের পর্দা উঠবে। ▮

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

 Low Cost readymade Latrine (Toilet) Low Cost House Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12,
71, Park Street, Kolkata - 700 016
98311 85740, 98312 72657, Visit Our
Website : www.calcuttawaterproofing.com

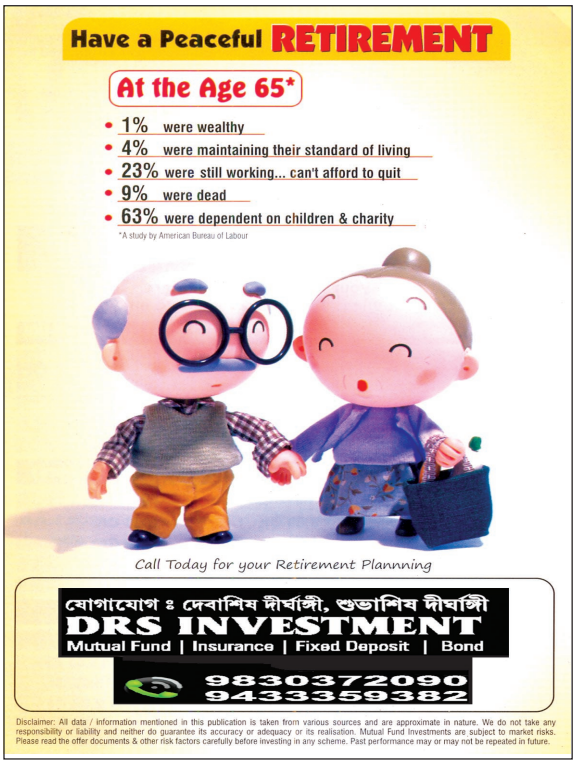

নেতাজীর অন্তর্ধানের সাত দশক : সত্য সামনে আসবে?

অভিরূপ নাগচৌধুরী

নেতাজীর জীবন, কাজ ও বক্তৃতা নিয়ে ঠিক কত নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে তার হিসেব পাওয়া যাবে। কিন্তু যে হিসেবটা কিছুতেই মিলবে না তা হলো, নেতাজী'র অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে গত সাত দশকে ঠিক কত কাগজ-কালি খরচ হয়েছে। গুজব তো কম রটেনি। কখনও শৈলমারীর সাধু, কখনও গুমনামীবাবা--- অনেককেই নেতাজী ঠাওরেজী আমরা। কারণ একটাই, ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী'র মৃত্যু হয়েছে এই কংগ্রেসী গালগল্পে আমরা আস্থা রাখতে পারিনি। তাইপে সরকার ওইদিন তাইহোকুতে কোনো বিমান দুর্ঘটনাই ঘটেনি বলে জানিয়ে দেওয়ায় এটুকু তো অন্তত পরিষ্কার হয়েছিল নেতাজীর অন্তর্ধান আগাগোড়াই রহস্যাবৃত। রেনকোজি মন্দিরে নেতাজী'র চিতাভস্ম বলে যেটাকে চালানো হচ্ছিল তা আসলে এক জাপানি সৈনিকের। অথচ এরপরেও কংগ্রেসি আসলে গঠিত শাহনাওয়াজ কমিশন ও খোসলা কমিশনের সিদ্ধান্তের বিপ্রতীপে অকংগ্রেসি আমলে গঠিত মুখার্জি কমিশন যখন রায় দিল তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী প্রয়াত হননি, তখন এক লহমায় তাকে বাতিল করে দিতে কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকারের বাধেনি। সবমিলিয়ে নেতাজীর ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে— এই রটনা যে কোনো কায়েমি স্বার্থের কাছে খুব জরুরি ছিল তা এখন দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

আজকের ভারতবর্ষ সেই কায়েমি স্বার্থ থেকে মুক্ত। এখন নেতাজী সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য প্রকাশ্যে আসার সুবর্ণ সুযোগ। ইতিপূর্বে একবার সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। এবারও সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটলে দেশবাসীর কাছে আমরা চিরঅপরাধী হয়ে থাকব। প্রশ্নটা খুব গুরুতর যে নেতাজী

সংক্রান্ত ফাইল আজও গোপনীয় থাকবে কেন? নিয়মানুযায়ী, ত্রিশ বছর পেরিয়ে গেলে স্পর্শকাতর ফাইলগুলি প্রকাশ্যে নিয়ে আসা যায়। বহুক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম হয়। এবং নেতাজী-র ক্ষেত্রেও সেটাই হচ্ছে। কিন্তু কেন? এই ফাইল প্রকাশ্যে এলে ভারতের কোনো বিশেষ পরিবারে আঘাত লাগবে বলে? না কি আমাদের বৈদেশিক সম্পর্কে তা কোনো প্রভাব ফেলবে? প্রথমত, কোনো বিশেষ পরিবার যদি একের পর এক কুকীর্তি করে ভেবে থাকেন, ভারতবর্ষে তাঁদের মৌরসিপাট্টা, তাহলে তার দায় সাধারণ দেশবাসী নেবেন কেন? দ্বিতীয়ত, ভয়টা আজকের প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ অমূলক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সারা বিশ্ব উথালপাথাল হয়েছে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গিয়েছে। সেই জাপান, সেই জার্মানি এমনকী সেই ইংল্যান্ড, সেই আমেরিকাও নেই। তাহলে আমাদের ভয়টা কোথায়? আর যদি কোনো কারণে এদের ওপরও কোনো আঘাত নেমে আসে, তাতে তো বর্তমান ভারতবর্ষের কোনো দায় নেই। পাপ আর পারা কি কখনো চাপা থাকে?

নেতাজী সংক্রান্ত দু'টি মাত্র ফাইল দিনের মুখ দেখেছে। আর সেই সূত্রে প্রাপ্ত নেতাজী পরিবারের সদস্যদের ওপর নজরদারির অভিযোগে কায়েমি স্বার্থের ত্রাহি ত্রাহি রব। নেতাজী সংক্রান্ত আরও অন্তত ৮৭টি ফাইল গোপনীয় রয়েছে, যার মধ্যে ২৯টি বিদেশ মন্ত্রকের অধীনে। ৫৮টি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাছে রয়েছে। এধরনের ফাইলগুলিকে সাধারণত চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথমত, উচ্চ গোপনীয় (টপ সিক্রেট), গোপনীয় (সিক্রেট), গুপ্ত (কনফিডেনসিয়াল) ও নিয়ন্ত্রিত (রেসট্রিকটেড)। আইনের যে দুই ধারার মধ্যে সংঘাতে এধরনের ফাইল প্রকাশ্যে আনার ক্ষেত্রে সমস্যা ঘটতে পারে সেই দু'টি ধারা হলো সরকারি গোপনীয়তা আইন (অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট) ও তথ্যের অধিকার আইন (রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট)। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্র সরকার সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা, বিদেশ মন্ত্রকের সচিব পর্যায়ের ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করেছে।

সুতরাং নেতাজী সংক্রান্ত যাবতীয় সত্য প্রকাশ্যে এবার আসবে দেশবাসী সেই আশাতেই এখন বুক বাঁধছেন। সত্য যতই কঠোর হোক, তাকে স্বীকার করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, ইতিহাসের শিক্ষাও বটে। দেশবাসীর সেই আশা ভঙ্গ করে তাদের বেদনাবিদ্ধ করার দায় এই সরকার নেবে না— এই আশা করা যেতেই পারে। ■

তোলাবাজি এই রাজ্যে কিছু নেতার আয়ের পথ

ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হকারদের লাইসেন্স দেওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। হকার ব্যবসা আগেও ছিল, কিন্তু তৃণমূল সরকার দিন দিন বেকার সমস্যা বাড়ছে দেখে এই সিদ্ধান্ত নেয়। ভোটের আগে নতুন চমকও বটে আর বর্তমান সরকারের আয়ের মাধ্যমও বটে!

ফুটপাতে যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁদেরকে তোলাবাজদের মাসোহারা দিতে হয়। শিয়ালদহ বিদ্যাপতি সেতুর নীচে ফুটপাতে, (কোলে মার্কেটের দিকে) নেতাজী মূর্তির ঠিক পিছনে ২ ও ৩ নং চাতালে দু'জন দীর্ঘদিন ধরে বসে জিনিসপত্র বেচেন এমন হকারকে তোলাবাজরা মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। শিয়ালদা এলাকায় ওই দুই হকার সংবাদমাধ্যমকে জানান, তারা গত ৩০ বছর ধরেই ওই এলাকায় বসে ব্যবসা করে আসছে। এজন্য তৃণমূলের নেতা অশোক পালকে প্রতিদিন ৯০ টাকা করে তোলা দিতে হয়। বেশ কয়েকদিন ধরে অশোকবাবু তার কাছে দৈনিক ৩০০ টাকা ও এককালীন ১ লক্ষ টাকা তোলা দাবি করে। অত টাকা দিতে অস্বীকার করায় ৭০/৮০ জন দুষ্কৃতী তাদের দুজনকে ভোজালি ও নেপালা দিয়ে কোপায় এবং বলে ৩০০ টাকা প্রতিদিন দিতে না পারলে বিহারে পাঠিয়ে দেবে। স্ত্রী রাগিনী বাধা দিতে এলে তাকেও মারধর করে। তিনজনকেই এন আর এস হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল।

দৈনিক সংবাদপত্র পড়ে মনে হচ্ছে, তৃণমূল তোলাবাজের দল হয়ে পড়ল। এতে হকার সমস্যা দিনের দিন বাড়বে বই কমবে না। হকার ও তোলাবাজের মধ্যে টাকা নিয়ে হবে রোজ মারামারি দলাদলি। সাধারণ মানুষের যারা রোজ ফুটপাত দিয়ে হাঁটাচলা করেন তাঁদের সমস্যা আরো বাড়বে। ব্যবসা খোল, আয়ের পথ বাড়াও খোলা মার্কেটে। জয় তোলাবাজের জয়!

—জয়রাম মণ্ডল,
কলকাতা-৬।

চিঠিপত্র

নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য

একজন দেশহিতৈষী, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নায়ক এবং মহান ব্যক্তিত্ব নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচন করার প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। সম্প্রতি নেতাজীর অন্তর্ধান সংক্রান্ত গোপন ফাইল প্রকাশ্যে আনার জন্য সুভাষচন্দ্রের নিকট-আত্মীয়রা সচেষ্ট হয়েছেন। নেতাজী নিয়ে তোলপাড় জাতীয় রাজনীতিও। বস্তুত এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে এর আগে দেশের কোনো কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট হয়নি। আর এর নেপথ্যে কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে গঠিত কংগ্রেস সরকারের উদাসীনতাকেও দায়ী করা অমূলক নয়। কারণ নেতাজী আতঙ্ক থেকে নেহরু পরিবার কখনোই মুক্ত ছিল না। বিভিন্ন পত্রিকায় এ নিয়ে বিভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণও করা হয়েছে। নেতাজী বিরোধী চক্রান্ত, বৃটিশের সেবাদাস হিসেবে নেহরুর ভূমিকা সহ কলঙ্কময় কাহিনিগুলো প্রকাশ্যে আসুক তা নেহরু পরিবারের কখনোই কাম্য ছিল না। আর নেতাজীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আপোশহীন সংগ্রাম সম্পর্কেও ভীত সন্ত্রস্ত ছিল নেহরু পরিবার। এই নেতাজী ভীতির জন্যই নেতাজীর অন্তর্ধানের নেপথ্যে নেহরুকেও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নেহরু নেতাজীর মতো উচ্চ রাজনৈতিক রাষ্ট্রনায়কের জনপ্রিয়তাকে ভয় করতেন বলেই নেতাজীর পরিবারের লোকজনের উপর তাঁরই নির্দেশে তৎকালীন গোয়েন্দাদপ্তর প্রায় ২০ বছর ধরে নজরদারি চালিয়েছিল। আবার নেতাজীর মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য বহু অর্থব্যয়ে শাহনওয়াজ কমিশন, খোসলা কমিশন, মুখার্জী কমিশন গঠিত হলেও রহস্যের কিনারা করতে সফল হয়নি। বলা যায়, নেহরু পরিবারের পরোক্ষ প্রভাবের ফলেই বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিশনগুলো নিরপেক্ষ তদন্ত করতে পারেনি। যদিও মুখার্জী কমিশন বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুকে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এই রিপোর্টকে মান্যতা দেয়নি। বরং পরবর্তীসময়ে রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত ভস্ম নেতাজীর বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। যদিও সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। অর্থাৎ মিথ্যা বার্তা দিয়ে দেশবাসীর সঙ্গে দীর্ঘদিন প্রতারণা করে গেছে নেহরু-গান্ধী পরিবার। নেতাজীর মতো মহান্ দেশপ্রেমিককে নিয়ে চক্রান্ত করে গেছে। আর এই নেহরু পরিবারতন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো যেন তেন প্রকারেন দিল্লীর মসনদ দখলে রাখা। এই ঘৃণ্য মানসিকতায় দেশ রসাতলে গেলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে অসম্মান করার অর্থ সমগ্র জাতির অপমান করা। তবে বর্তমানে মোদী সরকার নেতাজীর মৃত্যুরহস্য সম্পর্কে নানা তথ্য উদঘাটনের ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতেই পারে। আর নেতাজী সংক্রান্ত গোপন তথ্য প্রকাশ হলে সাধারণ মানুষের ঘৃণার আগুনে নেহরু পরিবারতন্ত্রের অবসান ঘটলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। সেই সঙ্গে দীর্ঘকালের সংশয় নিরসন হওয়ার পথ সুগম হবে।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী।

হিন্দু বাঁচলে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র সবই বাঁচবে

মুসলমান আক্রমণকারী মহম্মদ ঘোরি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল। আগে বীর পৃথ্বীরাজ চৌহানের কাছে পরপর দুবার শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায় ঘোরি। তারপর আসে সেই অভিশপ্ত রাত, যখন রাতের অন্ধকারে বিশ্বাসঘাতক জয়চাঁদের সহযোগিতায় কাপুরুষের মতো বিশ্রামরত পৃথ্বীরাজের সেনাবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘোরি। এবং পৃথ্বিরাজকে পরাস্ত করে। এরপর ভারতবর্ষের একের পর এক

রাজার উপর নেমে আসে ভয়ঙ্কর বর্বর ইসলামি আক্রমণ। ভারতবর্ষের এক একজন রাজা ইসলামি আক্রমণে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হয়েছেন আর সেই সঙ্গেই রাজ্যের প্রজাদের উপর নেমে এসেছে আরও ভয়ঙ্কর পরিণাম— হয় ইসলাম কবুল কর, নয় মৃত্যুবরণ কর। লক্ষ লক্ষ নিরীহ ভারতবাসী তাদের জীবন ত্যাগ করছেন কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করেননি। আমাদের মায়েরা কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন কিন্তু সতীত্ব বিসর্জন দেননি। কিছু মানুষ মৃত্যুভয়ে ইসলাম মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। আমাদের অনেক মা-বোন বর্বর নৃশংস ইসলামি লোলুপতার স্বীকার হয়েছিলেন। এভাবেই ভারতবর্ষে ইসলামের বিস্তার হয়েছে। বর্বর মুসলমান শাসকরা ভারতবর্ষের একএকটা রাজ্য দখল করেছে আর শয়ে শয়ে মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরি করেছে। অযোধ্যায় তথাকথিত যে বাবরি মসজিদ ছিল সেরকমই একটা নিদর্শন। তাই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার দ্বারা ওই স্থান খনন করে হনুমানের মূর্তি, মা সীতার মূর্তি-সহ বিভিন্ন হিন্দু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। একাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের উপর ইসলামি সন্ত্রাসের একটা সুপার সাইক্লোন বয়ে গিয়েছে। ভাবার বিষয়, তখনকার দিনে ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়া ছিল না। ভারতবর্ষের উপর নেমে আসা ইসলামিক সন্ত্রাসের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে অর্থাৎ ইরাক, সিরিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু মানুষদের উপর নেমে আসা ভয়ঙ্কর ইসলামি সন্ত্রাস দেখে অতীত ভারতবর্ষের হিন্দুদের উপর কী মারাত্মক আঘাত হয়েছিল তা চিন্তা করলে আঁতকে উঠতে হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্ব মুসলমানদের ক্ষেত্রে খাটে না।

মুসলমানদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্যই হলো সারা বিশ্বকে দার- উল-ইসলামে পরিণত করা। ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ ভূমিকে যথারীতি দার উল ইসলামে পরিণত করেছে মুসলমানরা। খণ্ডিত ভারতবর্ষ হিন্দুদের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি এবং শেষ আশ্রয়স্থল। স্বাধীনতার পর থেকেই খণ্ডিত ভারতবর্ষকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার চক্রান্ত চলছে। সেকুলার নামধারী বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও ভণ্ড ঐতিহাসিকরা এই চক্রান্তে মুসলমানদের সহযোগী।

বর্তমান নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের দিকে ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি একজন জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী হিসাবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, অবিলম্বে ভারতবর্ষের সব নাগরিকের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করা হোক। নয়তো এর সুযোগ নিয়ে মুসলমানদের সংখ্যা ৪০ শতাংশ হলেই এরা ভারতবর্ষকে দার-উল- ইসলামে পরিণত করবার জন্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে আবার ডাইরেক্ট অ্যাকশনে নামবে।

পরিশেষে, ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেশের সরকারের সঙ্গে দেশের জনগণেরও রয়েছে। 'বসুধৈব কুটুম্বকম' (পৃথিবীর সবাই আত্মীয়)-মন্ত্রে বিশ্বাসী হিন্দুরা বাঁচলে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র সবই বাঁচবে।

—প্রদীপ নাহা,
নিমতলা, হরিণঘাটা, নদীয়া।

স্বামীজীর প্রতি অবজ্ঞা, না সংখ্যালঘু তোষণ?

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিবেকনগর চৈতন্যপুরে 'বিবেকানন্দ মিশন নেত্র নিরাময় নিকেতন' নামে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল আছে। তাতে উন্নতমানের চক্ষুচিকিৎসা হয়। চিকিৎসক, পরিচালক ও অ-চিকিৎসক কর্মীরাও রোগীর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। কিন্তু হাসপাতাল পরিসরের মধ্যে কোথাও স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি বা ছবি নেই। কর্তৃপক্ষের লোকজনকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া যায়— এটা হাসপাতাল, এখানে মূর্তি বা ছবির প্রয়োজন নেই। কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোনো কোনো কর্মী বলেন, এখানে বহু সংখ্যালঘু সমাজের লোকেরা চিকিৎসা করাতে আসেন, তাই স্বামীজীর মূর্তি বা ছবি রাখা হয়নি।

মনে প্রশ্ন জাগে, স্বামীজীর নামে হাসপাতাল, তবু স্বামীজীর মূর্তি বা ছবি নেই, এটা কি স্বামীজীর প্রতি অবজ্ঞা, না সংখ্যালঘু তোষণ?

—রবি ঘোষ,
বড়মুডা সানমুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অশোক কুমার ঠাকুর

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে উপজাতি শব্দটি দ্ব্যর্থক। (১) অনাদিকাল থেকে নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণ ও লৌকিকতা নিয়ে বেঁচে থাকা পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী উপজাতি হিসেবে পরিগণিত এবং (২) কোনো একটি অঞ্চল বা ভূখণ্ডের সুপ্রাচীন অধিবাসী।

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে অন্যূন ২০/২৫টি উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ্য করা যায়। এরা হলো, কোচ-রাভা, টোটো, লেপ্‌চা, ভুটিয়া, গারো, মেচ, লিম্বু, ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, খেড়িয়া, মাহালি, কোরা, নাগেশিয়া মালপাহাড়ি, ডুপকা, চাক্‌মা, হাজং, কোল, ভিল, ধিমাল, কিচক, চেরো প্রভৃতি।

এই গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি উত্তরবঙ্গের আদি উপজাতি বা আদি অধিবাসী নয়। তাছাড়া এদের মধ্যে মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত ধিমাল, চেরো খেরিয়া, কিচক, ভিল, মুণ্ডা এবং আরও কয়েকটি গোষ্ঠী আজ অবলুপ্ত। উত্তরবঙ্গে আদিম উপজাতি— মেচ, কোচ-রাভা, গারো, টোটো লেপচা, ভুটিয়া, লিম্বু প্রভৃতি সকলেই মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত। বাকি সাঁওতাল, ওঁরাও, কোল প্রভৃতি বহিরাগত। এরা চা-শ্রমিকের কাজ করতে এসে উত্তরবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। আশ্চর্য হলেও সত্য, বহিরাগতদের মধ্যে কোনো গোষ্ঠীই মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত নয়। এরা হয় অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, নয় কোল গোষ্ঠীভুক্ত।

উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত ভূখণ্ড পূর্বতন কামতাপুর রাজ্যের প্রধান ও প্রাচীন অধিবাসী রাজবংশী। রাজবংশী উপজাতি নয়। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এরা কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত তা নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মহলে বিভিন্ন মত রয়েছে।

অধুনা উত্তরবঙ্গ বলতে যে ভূভাগটি চিহ্নিত, সেটি জলপাইগুড়ি বিভাগ— কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা। স্বাধীনতার পূর্বে এই ছয়টি জেলাই বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত ছিল। এই অঞ্চলটি সভ্যতার উষালগ্ন থেকে শুরু করে কোনোদিন-ই জনশূন্য ছিল না। ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রাচীনকালে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও পুণ্ড্রবর্ধন জনপদের অন্তর্গত ছিল। মালদা ছিল গৌড় জনপদের প্রাণকেন্দ্র। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকা ও কার্শিয়াং ছিল সিকিমের অধীনে। কালিম্পং ছিল ভুটানের অংশ। বর্তমান উত্তরবঙ্গ ভূখণ্ডটি তিনটি প্রাচীন ঐতিহাসিক অঞ্চলের ভগ্নাংশ নিয়ে গঠিত। তবু স্বতন্ত্র ঐতিহ্য, স্বতন্ত্র কৃষ্টি সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র রীতি নীতি এক কথায় নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যকে সযত্নে সংরক্ষণ করে হাজার হাজার বছর ধরে সহাবস্থান করে চলেছে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী জনসমাজ।

টোটো মহিলা।

পরম্পরাগত পোশাকে গারো দম্পতি।

রাভা মহিলা।

উত্তরবঙ্গের জঙ্গলাকীর্ণ সমতল ভূমি ও বিপদসঙ্কুল পাহাড়ি উপত্যকার কোলে সুদীর্ঘ অতীত থেকে অদ্যাবধি মৌলিকতা ও নিজস্বতা নিয়ে টিকে থাকা গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

মেচ বা বোড়ো :

ইন্দো মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি শাখা মেচ। মেচ ভাষাকে বড়ো ভাষা বলা হয়। বি. এইচ হর্জসন 'বড়ো' শব্দটিকে জাতি ও ভাষা উভয় অর্থে ব্যবহার করেছেন। স্থান বিশেষে 'বোড়ো' ও 'মেচ' উচ্চারিত হলেও জাতি হিসেবে অভিন্ন। এদের গায়ের রং হলদে আভাযুক্ত ফর্সা, চোখ ছোটো ও ফোলা, নাক মোটা ও চাপা, চুলের রং কালো, সুঠাম স্বাস্থ্য, উচ্চতা মাঝারি। 'গোঁফ প্রায় নেই, ঠোঁট ও চোয়ালের গঠনে মঙ্গোলীয় ছাপ প্রকট। মেচ সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রকৃতি উপাসক। এদের প্রধান দেবতা 'বাথৌ' বা 'বাঠৌ'। প্রধান দেবী সাইনাও। মেচরা ঘর তৈরি করে মাটি থেকে তিন চার ফুট উঁচুতে বাঁশের মাচা করে। ছন ও খড় দিয়ে তৈরি হয় ছাউনি। এদের মুখ্য জীবিকা কৃষি। মেচদের নিজস্ব লিপি নেই। দেবনাগরী ও বাংলা হরফের সাহায্যে ভাষা চর্চা করে থাকে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন গ্রামে এরা বসবাস করে।

কোচ-রাভা :

নৃতাত্ত্বিক বিচারে কোচ ও রাভা অভিন্ন, মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত একটি বিশেষ উপজাতি। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী। এদের গায়ের রং হালকা হলুদ ও তামাটে, নাক চ্যাপটা। গঠন সুঠাম। উচ্চতা মাঝারি। দাঁড়ি গোঁফ কম। মেচ-বোড়োদের সঙ্গে আকারগত সাদৃশ্য আছে। রাভা সমাজ পাঁচটি

গোষ্ঠীতে বিভিক্ত : রংদালিয়া, পাতি, দাহুড়ী, মায়াতোরী এবং কোচ। বর্তমানে 'রাভা' ও কোচ-সমার্থক হলেও আসলে 'কোচ' রাভা সম্প্রদায়ের একটি শাখা। উত্তরবঙ্গের রাভারা কোচ-রাভাগোষ্ঠীর মানুষ। রাভারা মূলত কৃষিজীবি। রাভারা বহু দেবদেবীর উপাসক। এদের জীবনে কামাখ্যামায়ের প্রভাব সমধিক। উর্বরতার অধীশ্বরী রূপে মা-কামাখ্যা পূজিতা। তাছাড়া লক্ষ্মী-পার্বতীর যুগল রূপে 'রৌন্তক বায়' মিচিক বায়, নুর বায়, জোকা-জুকুনি রাভা সমাজে পূজিত দেব-দেবী। রাভা সমাজে মেয়েদের স্থান যথেষ্ট উঁচুতে। বিয়ের পর মেয়েদের গোত্র পরিবর্তন হয় না। সন্তানের গোত্র পরিচয় হয় মায়ের গোত্রানুসারে। রাভাদের নিজস্ব ভাষা আছে 'কোচাক্রৌ' বা কোচ ভাষা। ইদানীংকালে রাভা সমাজে রাভামিজ ভাষার প্রচলন দেখা যায়। রাভাদের নিজস্ব বর্ণমালা নেই। বাংলা ও অ্যাসামিজ লিপিতে সাহিত্যকর্ম চলে। ধর্মপ্রাণ এই সম্প্রদায়টি অত্যন্ত নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়।

গারো :

গারোরা মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত একটি উপজাতি সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের একটি অংশ সুপ্রাচীনকালে তিব্বতের টারুয়া অঞ্চল থেকে অসমের ধুবরী হয়ে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। গারোরা নিজেদের পরিচয় দেয় 'আ-চিক-মাণ্ডে' বলে। আচিক অর্থে পাহাড় এবং মাণ্ডি অর্থে মানুষ। তবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও দিনাজপুর জেলার সমতলেও এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃতান্ত্রিক ধারায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারের পরিবর্তন ঘটে। মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বহন করে তার কন্যা। এভাবেই ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে।

খৃষ্টান মিশনারিরা গারোদের ধর্মান্তরিত করলেও তাদের সমাজে এখনো নানাবিধ পূজা পার্বণ প্রচলিত। তাত্রা মিট্‌দে গয়রা মিটদে শম্ভু মিট্‌দে গারোদের প্রধান দেবতা। বিদ্যাডিই মিট্‌দে, কামাখ্যা আগুক মিটদে— তাদের প্রধান দেবী। প্রাচীনকালে গারো সমাজে বিভিন্ন কথ্যভাষার চল থাকলেও বর্তমানে তারা 'কোচ-রাভা' ভাষাকে গ্রহণ করেছে। মেচ কোচ-রাভাদের মতোই এদের দৈহিক গড়ন ও গায়ের রং।

টোটো :

টোটোরা বিশ্বের ক্ষুদ্রতম উপজাতি এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম। অধুনা আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্গত মাদারিহাট থানার মধ্যে টোটোপাড়া অবস্থিত। পৃথিবীর অন্য কোথাও এই জনজাতির অস্তিত্ব নেই। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে টোটোদের গুরুত্ব অপরিসীম। টোটো উপজাতি টিবেট-মঙ্গোলয়েড নৃগোষ্ঠীর একটি শাখা। টোটোদের শারীরিক গঠন সুঠাম। ঠোঁট মোটা, নাক চ্যাপটা, চোখের পাতা ভারী, চুল দৃঢ় ও সবল, দাড়ি-গোঁফ খুব কম। ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী টোটোদের মোট সংখ্যা ১১৫৩ জন। এই কয়েক বছরে সংখ্যাটা অল্প বিস্তর বেড়েছে। টোটোরা প্রকৃতিগত ভাবে অত্যন্ত নিরীহ, ধার্মিক ও রক্ষণশীল। কালপ্রবাহ ও সমাজ বিবর্তনের অভিঘাতে টোটো জনজাতি নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয়নি— এখানেই টোটোদের বৈশিষ্ট্য। টোটোরা বাংলা ভাষায় লেখাপড়া করলেও ওদের মৌখিক ভাষা টোটো ভাষা। টোটো ভাষার লিপি নেই। টোটোরা প্রকৃতির উপাসক। ওদের মন্দির আছে, দেব-দেবীর মূর্তি নেই। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ কল্পনা করে চলে তাদের পূজা-পার্বণ। ওরা বিশ্বাস করে নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, আকাশ-নক্ষত্র সব কিছুরই প্রাণ আছে এবং তারা মঙ্গল ও অমঙ্গল— দুই-ই করতে পারে। টোটোরা আজ অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছে। জুম চাষ ও মৎস্য শিকার করে কোনোমতে জীবিকা নির্বাহ করে। তার উপর বহিরাগতদের ক্রমাগত অনুপ্রবেশের ফলে টোটোদের অধিকারে থাকা জমির পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

লেপচা :

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের (দর্জিলিং, কার্শিয়াং) প্রাচীনতম জনজাতি লেপচা সম্প্রদায়। বৃটিশ অধিগ্রহণের পূর্বে দার্জিলিং কার্শিয়াং অঞ্চলদুটো সিকিমের অন্তর্গত ছিল। সেই সময় এই অঞ্চল দুটি ছিল দুর্গম, জঙ্গলাকীর্ণ। দার্জিলিং নগরায়নের সময় (১৮৩৬) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লক্ষ্য করলো লেপ্‌চা ভিন্ন অন্য কোনো জনজাতির বসবাস এতদ্ অঞ্চলে নেই। লেপচরা মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত প্রাচীন উপজাতি। ইদানীংকালে গোর্খা নেপালি সম্প্রদায় পার্বত্য অঞ্চলের অধিকার নিয়ে যে দাবি করছে ইতিহাস কিন্তু নিয়ে অন্য কথা বলে। আসলে লেপচারাই এই এলাকার ভূমিপুত্র। লেপচারা বনবাসী হলেও অত্যন্ত স্বাধীনচেতা জাতি। সিকিম ও দার্জিলিং জেলার পার্বত্যভূমির উপত্যকাগুলিতে কৃষিকাজ, পশুপালন ও বয়নশিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। বাঁশ, দরমা, খড় দিয়ে গৃহ নির্মাণে দক্ষ। লেপচাদের নিজস্ব ভাষা আছে 'লেপচাভাষা', ভাষা বিজ্ঞানীরা যাকে একটি প্রাচীন ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে। ধর্মবিশ্বাসে লেপচারা মূলত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

ভুটিয়া, লিম্বু, রাজবংশী :

ভুটিয়া ও লিম্বুগোষ্ঠীভুক্ত জনজাতি উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী উপজাতি হলেও এই সম্প্রদায় দুটো উত্তরবঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী নয়। এদের আগমন ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। অন্যদিকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা উত্তরবঙ্গের প্রধান প্রাচীন অধিবাসী হলেও উপজাতি নয়।

তথ্যসূত্র :

(১) 'কোচবিহারের ইতিহাস'— খাঁ চৌধুরী আমনতউল্লা আহমেদ, (২) 'উত্তর আদিবাসীজীবনে পূজাপার্বণ'— প্রমথ নাথ, (৩) 'উত্তরবঙ্গের উপজাতি ইতিবৃত্ত'— রণজিৎ দেব, (৪) 'উত্তরবঙ্গের প্রান্তভূমির জনজাতি ইতিহাস ও সংস্কৃতি'— মহেন্দ্র দেবনাথ, (৫) 'বাঙালীর ইতিহাস' (সংক্ষেপে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব)— সম্পাদনা : কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, (৬) 'আদিবাসী রাভাদের পরিচয় ও উন্নয়ন'— ডক্টর সুবোধ সেন, (৭) 'কোচবিহারের ইতিহাস'— হেমন্ত কুমার রায় বর্ম্মা— এম. এ. বি. এল। (কোচবিহার রাজ্যের প্রাক্তন নায়েব আহিলকার— এস.ডি.ও), (৮) উত্তরবঙ্গ উৎসব সংখ্যা— স্মরণিকা— ২০১২, (৯) ক্ষেত্র সমীক্ষা, (১০) 'Dynastic History of Northern India'–Hemchandra Roy, (১১) 'Eastern India' Part III'– A.K. Das & M.K. Raha. ▌

ভালোবাসার ধনকে হারিয়ে নতুন করে পাওয়া

অমিত তার বাবাকে বার বার গাইতে দেখেছিল গানটা। হয়তো গানটার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তাঁর স্মৃতি, সত্তা, অনুভব। গানটার প্রতিটি শব্দ মনে ছিল দিদিভাইয়েরও। অমিতের থেকে কয়েক বছরের বড়। গলায় সুর ছিল। কিন্তু গাইতে চাইত না। বাবাকে দেখেছে পঁচিশে বৈশাখের সকালে রবীন্দ্রনাথের ছবির সামনে বসে অনেকক্ষণ কাটাতে। গান গাইতেন একটার পর একটা। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে পড়তেন। কয়েকদিন আগেই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের লেখা আর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখা বই সাজিয়ে রাখা হোত। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবি সাজানো থাকত। বাড়ির প্রত্যেকে জানত পঁচিশে বৈশাখে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাড়ির সমস্ত আবহে জুড়ে থাকবে রবীন্দ্রনাথ। অমিতও খুব ছোট থেকে এই ছবিটা মনে গেঁথে নিয়েছিল। ভালো লাগার অন্য মাত্রা যোগ হোত। বাড়ির সকলের ভালোলাগা ভালোবাসা মিলিত হয়ে নিবেদিত হোত একজনের চরণে। ছবির উপরে লেখা থাকত : 'ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সম্মান।' বাবা যখন পাঠ করতেন বা গাইতেন তখন কখনও বলতেন না, 'সামনে এসে বসো। আজ যাঁর জন্মদিন তাঁকে প্রণাম করো।' পরিবেশ দেখে অমিতরা মনের ভিতরে যেন ডাক শুনতো অংশ নেওয়ার। এরকম ভাবনা হয়তো সকলেরই হোত। তাই দেখত বাবার সামনে এসে বসেছে অনেকে। চুপচাপ শুনেছে। বাবা বলতেন, 'তোমরা অংশ নাও অনুষ্ঠানে। পড়ো গাও আবৃত্তি করো।' অনেকে ছবি আঁকে, তারা রবীন্দ্রনাথের ছবি এঁকে দিলো দাদুকে। পঁচিশে বৈশাখের ঠিক পরের দিন দাদুকে সবকিছু গুছিয়ে রাখতে দেখত। বইপত্র চলে যেত আলমারির নির্দিষ্ট তাকে। বাড়িতে নতুন কিছু বই এই সময় আসত। রবীন্দ্রনাথের লেখা ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত। সেগুলো পড়ার জন্যে সকলকে বলতেন। অমিত দেখেছে বাবার ঘরে রবীন্দ্রনাথের ছবির নিচে লেখা : 'প্রভু আমার প্রিয় আমার পরমধন হে/ চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।' বাবার এই রবীন্দ্র-অনুরাগ অমিত লক্ষ্য করেছিল বাড়ির সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সুন্দরভাবে।

পঁচিশে বৈশাখ এলেই বাবার গাওয়া গানটা মনে পড়ে অমিতের। পুরো গানটা বাজাবার আগে একবার মনে করে লিখে ফেলে খাতায়। পরে 'গীতবিতান' খুলে মেলালো। না, ভুল হয়নি একটুও। তারপর চোখ বুজে শুনল গানের ডিসক। একবার দুবার তিনবার। তারপর নিজে গাইল। সমস্ত অনুভবের মধ্যে একটার পর একটা ছবি ভেসে উঠতে থাকল। এটাই স্বাভাবিক। গীতবিতান-এর পূজা পর্যায়ের ৪৫ সংখ্যক গান। 'স্বরবিতান'-এর সপ্তম খণ্ডে রয়েছে। গানটি লেখা হয়েছিল ১৯১৫ সালের ৫ মার্চ। ২০ ফাল্গুন ১৩২১। 'ফাল্গুনী' নাটকের জন্যে লেখা। ফাল্গুনী প্রথম প্রকাশ পায় 'সবুজপত্র'র চৈত্র সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ বার বার চিরনূতনকে ডাক দিয়েছেন। গানের মধ্যে সে কথা এসেছে একটু অন্যভাবে।

অমিত গাইতে শুরু করল, 'তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ/ ও মোর ভালোবাসার ধন।/ দেখা দেবে বলে তুমি হও অদর্শন/ ও মোর ভালোবাসার ধন।' অমিত ফিরে আসে প্রথম অংশে। তারপর শুরু করে 'ওগো তুমি আমার নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালের—/ ক্ষণকালের লীলার স্রোতে হও যে নিমগন/ ও আমার ভালোবাসার ধন।' গান এগিয়ে যায়, 'আমি তোমায় যখন খুঁজি ফিরি ভয়ে কাঁপে মন—/ প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।/' অমিত গাইতে গাইতে আসে শেষে,

'তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে শেষ করে দাও আপনাকে যে—/ ওই হাসিরে দেয় ধুয়ে মোর বিরহের রোদন/ ও মোর ভালোবাসার ধন।' আবার প্রথমে চলে আসে, 'তোমায় নতুন করে পাব বলে—'

অমিতের বাবার দেহাবসান হওয়ার পর পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেছে। বাবা শেষ দিকে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ায় নিজে গাইতে পারতেন না। শুনতে চাইতেন। শুধু ওই গানটা নয় আরও অনেক গান। রবীন্দ্রনাথের গানকে পূজা ও প্রেম নামে আলাদা করা হলেও অমিত বাবার মত শুনত, 'পূজা আর প্রেম রবীন্দ্রনাথের গানে একাকার হয়ে গেছে।' রবীন্দ্রনাথ যখন ওই গানটি লেখেন তখন তার বয়স ৫৩। অমিতের বাবার জন্ম ২৬ বৈশাখ। সারাজীবন তাঁর রবীন্দ্রময় ছিল। ওই গানটির সৃষ্টির ৬৫ দিন বাদে তাঁর জন্ম। গানটি অমিতের কাছে শুনেছে তার মেয়ে আদুরি। সে পুরোটা গায় না। শুরুর অংশটা গায়। অমিত জানে, আর কয়েক বছর বাদে মেয়ে গাইবে। গানের কথা সুর মনের গভীরে ঢেউ তোলে। সেই ঢেউ কোনোরকম আলোড়ন তোলে না। কিন্তু বার বার ভাবায়। কারণ যে ভালোবাসার ধন তাকে ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে নতুন করে পেতে হয়। তার মধ্যেই ভালোবাসা পূর্ণতা পায়।

ওই গানের মধ্যে অমিত তার বাবাকে খুঁজে পায়। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও। দুজনেই তার অতি আপনজন। ■

একটু ভাবা

এখন শরীর মন ভালো রেখে কাজ করে পার্থ

দেবজিৎ মুখোপাধ্যায়

আগে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হোত পার্থর। ঘুম ভাঙলেও আলস্যে শুয়ে থাকত। ঘড়ির কাঁটাটা থামত না। সে এগিয়েই চলত। বাবার বরাবরের অভ্যেস ঠিক সাড়ে চারটেয় ওঠা। শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় একই রুটিন। বাবা ঘুম থেকে উঠে কারও কোনোরকম অসুবিধে ঘটায় না। মুখটুখ ধুয়ে ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়ে। সারা বছরই হাতে ছাতা থাকে। একটু বড় ছাতা। শৌখিন ছাতা নয়। বাবা রোজ সাতটায় বাজার করে। তখনও পার্থ শুয়ে আছে। বাবা বলে, ‘আমাদের কোনোসময়ে অ্যালার্ম ঘড়ির দরকার হয়নি। নিয়ম মেনে চলার অভ্যেস আছে বলে শরীর নিজস্ব ধারায় মানিয়ে নিয়েছে।’ পার্থর মা বলে, ‘সকালে উঠতে তো পারিস পার্থ। দেখবি তাতে কত কাজ হয়ে যায়।’ শোনে সবই, কিন্তু ওইটুকুই। সকালে আটটার আগে ওঠার অভ্যেস নেই। সারাদিনে আর শোয় না। রাত জেগে পড়াশোনা করে মাঝেমধ্যে। নিয়ম মেনে দশটায় শুয়ে পড়ে। ছটায় ঘুম থেকে উঠলে ভালো। কিন্তু আটটার আগে বিছানা ছাড়ার কথা ভাবে না। আটটার সময় উঠেই হুড়োহুড়ি। সকালে পড়াশোনা হয় না। চানটান সারতেই নটা। দশটা থেকে স্কুল। সওয়া নটায় বেরিয়ে পড়া। ছুটির দিন ছাড়া সকালে জলখাবার খাওয়া হয় না। একেবারে ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। মা দুপুরে খাবার জন্যে টিফিন দেয়। বেশির ভাগ দিনই স্কুলে টিফিন খাওয়া হয় না। বাড়িতে এসে খায়। সেই সঙ্গে মায়ের একটু বকুনি।

এইভাবে দিন মাস বছর কাটছিল পার্থর। হয়তো আরও কয়েকবছর ওইভাবে কাটত। কিন্তু সব গোলমাল করে দিল দিবাকর মামা। পার্থর ছোটমামা। ডাক্তারি পড়ে হসটেলে থেকে। পড়াশোনায় ভালো। দারুণ হইচই মজার মধ্যে থাকা পছন্দ করে। খুব খাটতে পারে। ভালো খাবার পেলে একটু বেশি খাওয়া হয়ে যায়— এটাই সমস্যা। ছ’ ফুট দু-ইঞ্চি লম্বা। চেহারার গড়ন ভালো। লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করে নিতে পারে সহজে। প্রাণ খুলে হাসতে পারে। সকলেরই চট করে ভালো লেগে যায় তাকে। পার্থকে ডেকে নিল। ওদের ওখানে সবুজ চারদিক। অনেক বাড়ি হলেও সকলেরই বোধহয় গাছপালার দিকে টান রয়েছে। পার্থ অনেকদিন সকাল দেখেনি। বেশ মনোরম মনে হচ্ছিল। ছোটমামা বলল, ‘চারদিকে তাকা। দেখ নতুন পাতা এসেছে গাছে। ফুল ফুটেছে। পলাশ গাছগুলো রঙিন হয়ে উঠেছে। কত পাখি উড়ছে। ডাকছে। ওদিকে দেখ কত ছেলেমেয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একটু বাদে বেলা বাড়লে সকালের এরকম রূপ থাকবে না। আমাদের ওখানে এত সুন্দর নয় চারদিক।’

সত্যিই ভালো লাগছিল পার্থর। সে বইতে পড়েছে একটা সংস্কৃত কথা : ‘শরীর মাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্’। ওদের স্কুলের হেডস্যার বলেন কথাটা খুব। শরীরচর্চাই হলো ধর্মচর্চা। খেলাধুলো ব্যায়াম করে শরীর ঠিকমতো গড়ে না তুললে জীবনে এগিয়ে চলা কঠিন। দুর্বল শরীরে অনেক অসুখ হামলা চালাবে। আজ পায়ে ব্যথা, কাল পিঠে ব্যথা এসব লেগেই থাকবে। শরীরের কসরত করলে মজবুত গঠন হবে। তাতে মনে জোর মিলবে। সবক্ষেত্রেই এগোন সহজ হয়ে উঠবে। শরীর গোলমাল করলে মন ভালো থাকবে না। পার্থ এসব আগে বুঝতে চাইত না। এখন বোঝে। মা যা খাবার দেয় সব খেয়ে নেয়। তিতো খাওয়ার সময় বিরক্ত হয় না। তেল মশলা কম খেতে শিখেছে। উল্টোপাল্টা খাওয়ার অভ্যেস উধাও হয়েছে। পার্থর খাওয়া নিয়ে মায়ের কোনো ভাবনা নেই আর। এখন অনেক বেশি কাজ করে। চটপটে ভাব আগের থেকে বেড়েছে। পার্থ এগিয়ে চলেছে।

ছোটমামা আসার পর বদলে গেছে পার্থ। বাবা মা যে ছোটমামাকে আসার জন্যে বলেছিল এটা সে জানত না।

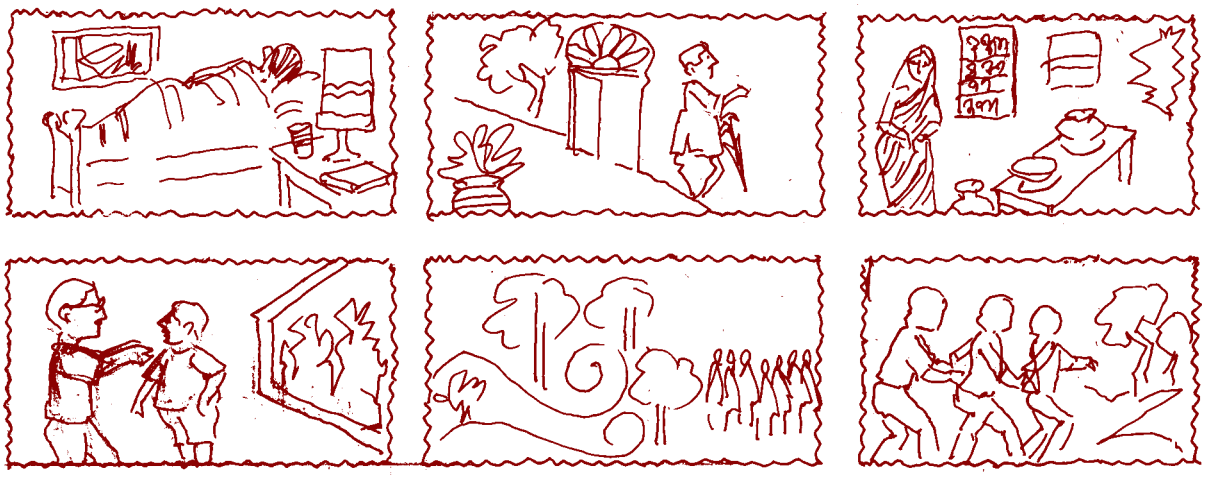

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

জন্মদিনে সপ্তর্ষি উপহার দিলো বন্ধুদের

এবছর জন্মদিনের আগে সপ্তর্ষি মাকে বলেছিল, ওদের পাড়ার কয়েকজন গরিব ছেলেমেয়েকে বইখাতা কিনে দেওয়ার জন্যে। মা খুব খুশি হয়ে বাবাকে জানাতে ডাক পড়ল বাবার ঘরে। কজন ছেলেমেয়ের কথা সপ্তর্ষি ভেবেছে তাদের নাম জানল। তাদের ভাইবোন আছে কিনা জেনে নিল। বাবাকে বলল, 'আমার জন্মদিনে বাড়িতে কিছু করতে হবে না। আমার কিছু চাই না।' বাবা বলল, 'সেসব তোমার মা জানে। আমি শুধু তোমার ইচ্ছাটা পূরণের চেষ্টা করবো। কাল আমরা খাতা বইপত্র কিনতে যাবো। তুমি একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করো ওদের কি কি বই, কটা খাতা দরকার। একটা করে ব্যাগ দিলে কেমন হয়?' সপ্তর্ষির দারুণ আনন্দ। সেদিন স্কুল থেকে ফিরে জেনে নিলো সব। সকলকে চেনে। একসঙ্গে খেলে। দুজন খেলতে পারে না। চায়ের দোকানে কাজ করে। দোকানদার আশিস দাস একটু অন্যরকম। ওদের পড়তে উৎসাহ দেয়। কখনও বকাঝকা করে না। সপ্তর্ষি যাদের কথা ভেবেছিল তারা প্রত্যেকে ভালো ছেলে। পরের দিন সব কিনে আনল বাবার সঙ্গে গিয়ে। বাবা যোগ করল দুটো করে কলম সকলের জন্যে। একদিন বাদে সপ্তর্ষির জন্মদিন। মা সকালে পাড়ার নামকরা মিষ্টির দোকান থেকে দশটা মিষ্টির প্যাকেট আনল। জন্মদিনের দিন সকালে মায়ের সঙ্গে গেলো দশজনের বাড়িতে। নিজের হাতে উপহার দিলো। বাবা যায়নি। মায়ের কাছে সব শুনে সপ্তর্ষিকে বলেছিল, 'এই মনটা বরাবর রেখে বড় হও সবকিছুতে।'

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. অবনীন্দ্রনাথ কে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের?

২. শিলাইদহতে রবীন্দ্রনাথ কি কাজের জন্যে যান?

৩. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের কে?

৪. রবীন্দ্রনাথের ছেলেমেয়েদের নাম কি?

৫. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ কে? তিনি দেবেন্দ্রনাথের কে?

উত্তর : ১. ভ্রাতুষ্পুত্র। ২. জমিদারি দেখাশোনার জন্যে। ৩. দাদা। ৪. মাধুরীলতা, রথীন্দ্রনাথ, রেণুকা, মীরা, শমীন্দ্র। ৫. গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সহোদর ভাই।

ফিরে পড়া

অনুভব : ১৯৪৬

সুকান্ত ভট্টাচার্য

(১৯২৬-১৯৪৭)

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে।
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ;
স্বপ্ন-চূড়ার থেকে নেমে এসো সব—
শুনেছ? শুনেছ উদ্দাম কলরব?
নয়া ইতিহাস লিখেছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদ-পট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
দেখো আজ তারা সবেগে সমুদ্যত,
তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি বাঁচি।
তাই তো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ, বিপ্লব চারিদিকে।।

বনবাসী সমাজে নারী

শুভশ্রী দাস

বনবাসী সমাজে মহিলারা পুরুষের সঙ্গী। পুরুষদের তারা সহকর্মী। সমাজ ও পরিবারে তাদের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকে। বনবাসী মহিলারা গ্রাম বা শহরের অন্য সমাজের মহিলাদের মতো পুরুষদের মুখাপেক্ষী থাকে না। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহের জন্য তারা তাদের পুত্র বা স্বামীর ওপর নির্ভরশীল নয়। ঈশ্বরের কৃপায় তারা অন্য সমাজের মহিলাদের থেকে

শারীরিকভাবে সক্ষম। তারা শুধু ঘরকন্নার কাজ করে না, ছেলেমেয়ে প্রতিপালন করেও তাদের সারাদিন জমিতে কাজ করতে দেখা যায়। জমিতে ফসল বুনতে, বড় করতে ও ঘরে তুলতে সারা বছরই এদের বড়ো ভূমিকা থাকে। মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার বনবাসী মহিলাদের অধিকার অসীম। ঘরে-বাইরে সমস্ত কাজ তারা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের স্বামী প্রতি পদে তাদের অনুগামী থাকে। খুবই পরিশ্রমী ও স্বাভিমানী এই সমাজের মহিলারা।

খেত-খামারের কাজকর্ম থেকে হাটবাজার সব এরাই করে। কোন জনিতে কী চাষ হবে তা ঠিক করে এরাই। পরিবারের জমিজমার পুরো অধিকার মেয়েদের ওপর থাকে। ধানের চারা ওঠানো, কড়া রোদ অথবা মুসলধারে বৃষ্টির মধ্যে রোপণ করা, দেখাশুনা করা এবং ঘরে তোলা সবই মহিলাদের দায়িত্ব। বাজারে বিক্রির দায়িত্বও তাদের। বনবাসী সমাজে এমন কোনো মহিলা পাওয়া যাবে না যে শুধু ঘরের কাজ করে। এই সমাজের স্কুল-কলেজে পড়া মেয়েরাও পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে খেত-খামারের কাজও সমানভাবে করে।

বনবাসী সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টা গ্রাম-শহরের শিক্ষিত মেয়েদের কল্পনার অতীত। ফসল লাগানোর পর তদারকির জন্য যখন মহিলারা জমিতে ব্যস্ত থাকে তখন পুরুষরা বাড়িতে শিশুদের পরিচর্যায় মনোনিবেশ করে। ঘর মেরামতির কাজ করে। বাড়ির উঠানে বা লাগোয়া জমিতে সবজি, ফল বা লতাপাতার গাছ দেখাশুনা করে। ঘরে বৃদ্ধ বাবা-মা বা ঠাকুরদা-ঠাকুরমার প্রতি খেয়াল রাখে। প্রতি পদক্ষেপে পারস্পরিক সহযোগিতা ও স্ত্রী-অস্মিতার অপূর্ব মিশ্রণ বনবাসী সমাজে দেখা যায়। এই সমাজের মহিলারা পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারিণী। তাদের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন যে, তারা নিজের জীবনসঙ্গী নিজেই বেছে নিতে পারে। শুধু তাই নয়, বিয়ের আগেই হবু স্বামীকে বাজিয়ে দেখে নেওয়ার অধিকারও তাদের পূর্ণমাত্রায় থাকে। এই পরম্পরাকে তাদের ভাষায় লমসেনা বলা হয়। এই প্রথায় বিবাহযোগ্য যুবককে যুবতীর বাড়িতে থেকে সমস্ত কাজকর্মে নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত হতে হয়। এই পরীক্ষায় পাশ অথবা ফেল করানোর পুরো অধিকার যুবতীর ওপর থাকে। এই প্রথা এখনও মধ্যপ্রদেশের গোণ্ড সমাজে পূর্ণ মাত্রায় আছে।

বনবাসী সমাজের মেয়েরা একা থাকতেও ভয় পায় না। ঈশ্বর তাদের শারীরিক শক্তি পুরুষদের থেকে কম দেননি। এই সমাজের মহিলারাও তির-ধনুক, বল্লম, গুলতি ব্যবহারে বেশ দক্ষ। ধনী বনবাসী পরিবারে তাই ডাকাতি হওয়ার কথা খুব কম শোনা যায়। শিশুকাল থেকেই মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে তির-ধনুক, বর্শা ও গুলতি ব্যবহারের শিক্ষা স্বাভাবিকভাবেই পেয়ে থাকে। সারাদিন মাঠে-ঘাটে-খাদানে হাড়-ভাঙা খাটুনি করেও সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয় পুরুষদের সঙ্গে মাদলের তালে তালে তারা পরম্পরাগত নৃত্যগীতে মেতে ওঠে তখন মনেই হয় না সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হওয়ায় পুরুষরা তাদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারে না। কোনো বনবাসী দম্পতি ক'টি সন্তানের জনক-জননী হবেন তাও নির্ভর করে স্ত্রীর সম্মতির ওপর। আজ বনবাসী সমাজের অনেক মেয়ে লেখাপড়া শিখে হিল্লী-দিল্লী এমনকী ইংলন্ড, আমেরিকাতেও বসবাস করছে।

আজ নারীশক্তি জাগরণ, নারী সচেনতা বৃদ্ধির জন্য নানা রকমের সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ চলছে। কিন্তু লোকচক্ষুর অগোচরে নারী স্বাধীনতার অগ্রদূত এই বনবাসী সমাজের মহিলাদের কথা বড়ো কেউ উল্লেখ করেন না। যদি শহরের মতো সুযোগ-সুবিধা এরা পেত তাহলে এদের মনোবল, উৎসাহ ও শক্তি বাকি নারী সমাজের কাছে অনুকরণীয় হতো— একথা জোরের সঙ্গেই বলা যায়।

উর্দু সমাচারপত্রের স্বীকারোক্তি

ক্রমবর্ধমান মুসলমান জনসংখ্যা

অতিথি কলম

মুজফ্‌ফর হোসেন

মানব জাতির আসল পরিচয় হলো তার মাটি ও তার দেশ। কিন্তু এই নিগূঢ় সত্যকে কখনই অগ্রাহ্য করা যায় না যে, এক শ্রেণীর মানুষ দেশের সঙ্গে নিজের পরিচয়কে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে এবং যে ধর্ম, পন্থ বা রীতিনীতির তারা অনুসারী, তাকেই বেশি প্রাথমিকতা দিচ্ছে। প্রতিটি ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য ভাষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে। তাই কোন ভাষা অধিকতর প্রচলিত সেই দিকেরও খেয়াল রাখা হয়। ধর্ম, ভূমি, ভাষা— এগুলির সমন্বয়েই সংস্কৃতি গঠন হয়। সেই কারণে অজান্তেই

ভাষাকে ধর্ম ও ভূমির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আজকের দুনিয়ায় বসবাসকারী মানুষকে যদি ধর্মের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে উপলব্ধি করা যাবে যে খৃষ্টান ধর্মের মানুষদের জনসংখ্যা সব থেকে বেশি। তারপরেই ইসলাম ধর্মের মানুষজন অর্থাৎ মুসলমানদের নম্বর। অতীতে একটা সময় ছিল যখন ধর্মই আচার-বিচার, নিয়ম-কানুনের মূল স্রোত ছিল, কিন্তু যখন থেকে আমাদের সমাজ আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাস করা শুরু করল, তখন দেশের সভ্যতার ওপরেও ধর্মের রীতি-নীতির গাঢ় ছায়া পড়তে আরম্ভ হলো। সমস্ত সভ্যতার প্রগতির প্রতিযোগিতায় ধর্মের ভূমিকা সব থেকে বেশি ছিল। সেইজন্য ভৌগোলিক ক্ষেত্রবিশেষে যে সব দেশের জন্ম হয়েছে সেগুলো কোনো না কোনো ধর্মস্থল, ধর্মীয় রীতিনীতি বা 'মজহব'-এর কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। হজরত মুসা, ইসা, মোহম্মদ সবাই আরব অঞ্চলে জন্মেছে, তাই এই পয়গম্বরদের কর্মস্থলও এই সমস্ত দেশেই সীমাবদ্ধ। পরে যাতায়াত ও সঞ্চারমাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ পরিচিতি পাওয়ার পর, সেই স্থানের অধিকার পাওয়ার জন্য ধর্মেরই ব্যবহার করা হলো। পরে যখন ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়, তখন তা সভ্যতার সংঘর্ষের কেন্দ্ররূপে দেখা দেয়। পশ্চিমি দুনিয়ায় এই তিনটি ধর্মীয় পথ যত শক্ত হয়েছে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে তত হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের চিন্তাধারার বিস্তার ঘটেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি যেহেতু কৃষিভিত্তিক ছিল তাই এদের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ ঘটেনি। কিন্তু মধ্যপূর্ব অংশের মুসলমান ধর্মকে সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিয়েছিল। যদিও আজ সামাজিক ও সার্বভৌমিক জীবনে এরা ধর্মীয় হস্তক্ষেপ নীতিকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে তারাও পশ্চিমি দুনিয়ার মতো ভণ্ড ও নির্লজ্জ। কিন্তু এর ঠিক বিপরীত হলো হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন। এরা নিজেদের সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে সমন্বয়ের নীতিকে পাথেয় করে। হিন্দুরা রাষ্ট্রীয় সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করেনি, বরং তাকে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে সাজিয়ে মানবতার চতুর্মুখী বিকাশের কাজে লাগিয়েছে। এই কারণে পাশ্চাত্য দেশগুলি যেখানে ভাষাকে নিজেদের সত্তা লাভের মাধ্যম বানিয়েছে, সেখানে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর জন্য যখন রাজনৈতিক প্রভাব দেখানোর আবশ্যকতা দেখা দিল তখন পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলি ভাষাকেও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যম বানিয়ে নিল। যেখানে ভাষা বিস্তার লাভ করবে সেখানে ভাষার ওপর আধারিত ধর্মও বিস্তার লাভ করবে। ভারতীয় মুসলমানরা উর্দুকে নিজেদের অস্তিত্বের মাধ্যম বানিয়ে ফেলেছে, তাই উর্দু সংবাদপত্রে যা লেখা থাকে তাকেই তাদের সত্য বলে মেনে নিতে হয়। এমনই একটি কঠোর সত্য বিগত দিনে উর্দু প্রেসে লেখা হয়েছে--- 'ভারতে মুসলমান

জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান'। শুধু এটাই নয়, এই জনসংখ্যা বাড়লে আজকের সংখ্যালঘু আগামীকাল সংখ্যাগুরুতে পরিণত হবে। মাতৃভাষা দিবস প্রতিবারের মতো এবারেও তারা ভারতে পালন করেছে। অনেক উর্দু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে সেই সুযোগে ভারতে অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে মুসলমানদের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই সম্বন্ধীয় কিছু উর্দু দৈনিকের লেখা এখানে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র এই বিষয়ে নিজেদের টিপ্পনী প্রকাশ করেছে :

২৩ জানুয়ারি 'দৈনিক সিয়াসত' লিখেছে যে, ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে, তুলনায় ভারতের অন্যধর্মের মাত্র ১৮ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ ৬ শতাংশ হারে মুমসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে। ভারতে সর্বাধিক মুসলমান জম্মু-কাশ্মীরে বাস করে। সেখানে মুসলমান জনসংখ্যা ৬৮.৩ শতাংশ। তার পরের স্থানে রয়েছে অসম, সেখানে মুসলমান জনসংখ্যা ৩৪.২ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় স্থানে, ২৭ শতাংশ। এই উর্দু দৈনিক এই সত্যটাও স্বীকার করেছে যে, ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মুসলমান জনসংখ্যা ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। তারপর এমন একটা সময়ও এসেছে যখন মুসলমান জনসংখ্যা কমে ২৪ শতাংশ হয়েছে। তবে অসমে মুসলমান সংখ্যা বহুল পরিমাণে বেড়েছে। ২০০১-এ ২৫.২ শতাংশ ছিল, সেটা ২০১১-তে ২৭ শতাংশ হয়েছে। এই পরিসংখ্যান দেখে এটা বলা যায় যে, অন্য জায়গা থেকে অসমে মুসলমান জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে সেই সংখ্যা ১১.৯ থেকে বেড়ে ১৩.৯ হয়েছে। ২ ফেব্রুয়ারিতে দিল্লী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিত 'নই দুনিয়া' মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা স্বীকার করেছে। পত্রিকায় বলা হয়েছে, 'দারিদ্র্যর জন্য মুসলমানরা পরিবার পরিকল্পনা করে না। মুসলমানদের ঘরে একটা নতুন বাচ্চার জন্মের অর্থ একজন নতুন উপার্জনকারী আসা। গ্রামের দিকে আজও মানা হয় যে যার সব থেকে বেশি বাচ্চা থাকবে সে-ই প্রভাবশালী ও ভাগ্যবান। উর্দু সংবাপত্রটির মতে, যদি সরকার মুসলমানদের পরিবার পরিকল্পনা চায় তাহলে তাদের শিক্ষা ও রোজগারের ব্যবস্থা করুক, যেটার দ্বারা তাদের পুরনো ভ্রান্তিকে ভাঙা যায়। পত্রিকাটির এটাই বক্তব্য যে, বেশি সন্তান জন্ম দেওয়ার অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্য। বিত্তশালী মুসলমানদের তুলনামূলক কম সন্তান জন্ম দেওয়ার অন্যতম কারণের ওপর যখন আলোকপাত করা হয়, তখন বিতর্কটা আর একটু স্পষ্ট হয়। অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ সবসময়েই অনুপ্রবেশকারীদের মুক্তাঞ্চল হিসাবে পরিচিত, তাই যতদিন না অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করা হচ্ছে মুসলমানদের ওপর থেকে এই কলঙ্ক ধোয়া যাবে না। সরকার যদি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দেয় তাহলে এই অভিশাপ আজ সমাপ্ত হতে পারে। হিন্দু পরিবারের মধ্যে শিক্ষার আলো দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। তাই তারা এর থেকে দূরে থাকে। হিন্দুদের বঞ্চিত এবং পিছিয়েপড়া বর্গের মধ্যে আর্থিক সহায়তা সঠিক ভাবে পৌঁছতে পারে। তাই তারা তাদের জীবনস্তর সঠিকভাবে চালনা করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা সেই অনুপাতে উৎসাহিত না হওয়ার জন্য ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে।

সরকার যদি এইদিকে সক্রিয় হয় তাহলে মুসলমানরাও হিন্দুদের মতো প্রগতিশীল হতে পারে এবং পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবে। সাপ্তাহিক 'নই দুনিয়া'-তে লেখা হয়েছে, হিন্দু সংগঠনগুলি বারবার এই স্লোগান দিতে থাকে যে, যদি মুসলমানরা এই ভাবেই সংখ্যায় ক্রমাগত বাড়তে থাকে তাহলে হিন্দুরা কিছুদিনের মধ্যেই অল্পসংখ্যক হয়ে পড়বে। তাই মুসলমানরা সর্বদাই এই বিষয়ে অপমানের ভাগীদার হয়ে থাকে। কিন্তু দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'জামাত-ই-ইসলামি'-র পত্রিকা 'দাওত'-এ বলা হয়েছে যে, এই প্রকার খবর একটি ষড়যন্ত্র করে প্রকাশ করা হয়। মুসলমানদের ওপর মিথ্যা অভিযোগ লাগানো ভারতে সংখ্যাগুরু জনগণ এবং সংবাদমাধ্যমের জেনে বুঝে করা ষড়যন্ত্র মাত্র। তাই সংবাদমাধ্যমে এই প্রকার অবাস্তব খবর ছাপা একটি নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হয়ে দাঁড়িছে। উপরোক্ত বিশ্লেষণ নিজস্থানে হয়তো প্রাসঙ্গিক, কিন্তু এই বাস্তবটি অস্বীকার করা যায় না যে, পরিবার পরিকল্পনা নীতি না মানাটা 'শরিয়ত'-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ইসলামি বিদ্বান ও মৌলানাদের মত হলো, মুসলমান সমাজ পরিবার পরিকল্পনা নীতিকে মান্যতা দেয় না। তাদের এটাই বিশ্লেষণ যে, কোনো জীবের অস্তিত্বকে বাড়তে না দিয়ে আটকে রাখা, মজহবের দিক দিয়ে একেবারেই বৈধ নয়। এভাবেই সাধারণ মুসলমানদের কোরান ও হাদিসের মাধ্যমে খুব সহজেই বোকা বানানোর খেলা চলছে।

আজ পর্যন্ত এই বিষয়টি নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে 'ইজমা' (জনমত সংগ্রহ) হয়নি, আর কোনো ফতোয়াও জারি হয়নি। যদি এই বিষয়টি নিয়ে খুব আলোচনা হয়, তাহলে নিশ্চিত সাধারণ মানুষ এটিকে বুঝবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এই নীতি বিশ্বের কোনো দেশেই প্রয়োগ করা হয়নি। ধর্ম বা 'মজহব'-কে সামনে রেখে মুসলমানরা তাদের জনসংখ্যা বাড়ানোতে কোনো আপত্তি দেখে না। যখন শুধুমাত্র পোলিও নিরোধক প্রচারে সরকার মুসলমান বস্তিতে সফল হয়নি, তখন পরিবার পরিকল্পনার মতো গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন যে সফল হবে না এটাই তো স্বাভাবিক। তাই এমন কোনো মূর্খ নেই যে পরিবার পরিকল্পনার কথা বলে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক নষ্ট করবে। যদি কেউ এই সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাফল্য পেতে চায় তাহলে বেশি সন্তান ধারণের যে 'মজহবি' ধারণা তৈরি করা হয়েছে, সেই ধারণাকে নির্মূল করা খুব জরুরি। ■

থাকে যদি
ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা

ডাটা®
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়

কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন

pure INDIAN SPICES

Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.

207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের অঙ্গন তুলসীগাছে ভরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আমাদের দেশের সব প্রধানমন্ত্রীই ফুল ফল গাছপালা ভালো বেসেছেন। তাদের বাসভবনের প্রশস্ত অঙ্গন ভরে থেকেছে নানারকম গাছগাছালিতে। সেসব ঠিকমতো তদারকির দায়িত্ব পেয়েছেন দক্ষ এবং কর্মিষ্ঠ উদ্যান বিশারদরা। তাঁরা অনবরত ভেবেছেন কীভাবে ছবির মতো রূপ নেবে উদ্যান। প্রধানমন্ত্রীর মন ভরালে তাঁর কাছে আসা অতিথিদের কাছেও দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব একই সঙ্গে ফৌজ ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের। সময়ের সঙ্গে নিরাপত্তার ছকও রূপবদল ঘটেছে প্রয়োজনমাফিক। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এবং লাগোয়া উদ্যান তত্ত্বাবধানের দায় ও দায়িত্ব কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের।

ইন্দিরা গান্ধী নিহত হয়েছিলেন তাঁর বাসভবনের অঙ্গনে। সেই বাসভবন পরে তাঁর স্মৃতি-স্মারক হয়ে ওঠে। তাঁর পুত্র রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় তাঁর বাসস্থান হয় রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান। রেস কোর্স রোডের সাত নম্বর বাড়ি। রাজীব গান্ধীর পর প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন অনেকে। তাঁরা কেউ দীর্ঘসময় থেকেছেন, কেউ স্বল্প সময়। শুধু চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রীর নির্দিষ্ট আবাসে থাকেননি। যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম পর পর উল্লেখ করা যায় : বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, নরসিংহ রাও, এইচ ভি দেবেগৌড়া, আই কে গুজরাল, অটলবিহারী বাজপেয়ী, মনমোহন সিং। এখন আছেন নরেন্দ্র মোদী। বিশ্বনাথ প্রতাপ সোজা চোখ তুলে কথা বলতে পারতেন না। তাঁর ফুল বাগান এসব ব্যাপারে আগ্রহ থাকেনি। নরসিংহ রাও কুশলী রাজনীতিক, অসীম জিজ্ঞাসা নিয়ে কাজ করতেন। উদ্যান বিষয়ে সক্রিয় ভাবনা ছিল না। ভাবটা এমনই ছিল, যা হচ্ছে হোক, মানানসই কিনা তা দেখার লোকজন আছেন তাঁরাই ঠিক করবে। দেবেগৌড়া দক্ষিণী মানুষ, ফুল বা উদ্যান প্রীতি সেখানকার অধিকাংশ মানুষের থাকে। দেবেগৌড়ার মধ্যে ওইরকম আগ্রহ দেখা যায়নি।

ইন্দ্রকুমার গুজরাল শিল্পবোধসম্পন্ন মানুষ বরাবর। তাঁর ভাই বিখ্যাত চিত্রকর ভাস্কর সতীশ গুজরাল। হয়তো তাঁর রুচি ও চেতনায় প্রকৃতি গুরুত্ব পেয়েছিল। আনাজপাতির বাগানেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। সরাসরি বাগান থেকে তাজা সবজি চলে আসত রান্নাঘরে। ডাঁটা খেতে ভালোবাসতেন। বাগানের তত্ত্বাবধায়কদের বলেছিলেন, এমন ঘাস লাগাতে যার ক্যানসার প্রতিরোধ শক্তি রয়েছে।

অটলবিহারী বাজপেয়ী দীর্ঘদিনের রাজনীতিক। অনেক প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছেন সাংসদ হিসেবে। তিনি যখন ৭ নম্বর রেসকোর্স রোডের বাসিন্দা হলেন তখন ফুলে সাজানো বাগান ভালোবাসতেন। প্রতিদিন অঙ্গনে হাঁটতেন। শুধু হাঁটা নয়, একেকদিন এক একটা ফুল গাছের সামনে দাঁড়িয়ে সেই ফুল সম্পর্কে বলতেন অন্যদের। রাজনীতিক সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল কবি মন।

রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর চেয়েছিলেন তাঁর কার্যালয়ের পিছনে স্বাভাবিক অরণ্য থাকুক কিছুটা অংশ জুড়ে। যত্ন করে লাগানো নয়। যেমন খুশি বীজ ছড়াতে বলেছিলেন যাতে চারাগুলো অরণ্যের মতো স্বাভাবিক রীতিতে বড়ো হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের নিরাপত্তার কথাও ভাবা হয়। কারণ কাছাকাছি থাকা সম্রাট হোটেলের সর্বোচ্চ তলা থেকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের অঙ্গন সরাসরি দেখা যায়। সেজন্যে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমতো সিলভার ওক গাছের বীজ ছড়ানো হয়। এখন সেই গাছ ৫০ ফুট উঁচু। দেখে মনে হয় এক চিলতে অরণ্য। তিনি ফুলও ভালোবাসতেন। সোনিয়া গান্ধী যখন রাজনীতিতে আসেননি তখন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বাগান সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহ তিনি রাজনীতির অঙ্গনে ঢুকে দেখাতে পারেননি— এই অভিমত অনেকেরই।

অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহ কি পছন্দ করতো জানা যায় না। যখন প্রধানমন্ত্রী হয়ে ৭ নম্বর রেসকোর্স রোডের বাসিন্দা হলেন তখন জানা গেল তিনি নানারকম টক লেবু পছন্দ করতেন।

এবার ৭ নম্বর রেসকোর্স রোডের বাসিন্দা হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি ভারতীয় জনতা দলের প্রতীক চিহ্ন পদ্ম চাষ প্রধানমন্ত্রীর জন্যে নির্দিষ্ট বাসভবনে করতে চাননি। তিনি তত্ত্বাবধায়কদের বলেছেন, উদ্যানের 'বাগান ভরিয়ে দিন ফল ফুলে। তবে আমার পছন্দ ঔষধীয় গাছ তুলসীর। ভরিয়ে দিন বাগান।'

আসলে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বাগানকে তিনি রাজনীতি মুক্ত রেখেছেন। চেয়েছেন দেশের সর্বত্র পদ্মফুল যেভাবে ব্যাপকভাবে ফুটছে ফুটক। দেশের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে যে বাসভবনে তিনি পাঁচ বছরের মেয়াদে এসেছেন সেখানে তিনি ভারতের সনাতন ভেষজ তুলসীগাছকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তুলসীর গুণাগুণ তিনি অনবরত বলেছেন।

৭ নম্বর রেসকোর্স রোডের অঙ্গন তুলসীগাছে ভরে উঠছে দক্ষ উদ্যানবিদদের পরিচর্যায়। হয়তো দেশের অন্যত্রও এই তুলসী অনুরাগ ছড়িয়ে যাবে। সেরকম হলে কোনো ক্ষতি তো নেই। ■

গরিমাটা কোথায়?

শেখর সেনগুপ্ত

আমন্ত্রণের মধ্যে সুরভি ছিল। ছিল আনন্দের গুনগুন রব। অনেককাল বাদে বর্ধমান শহরে যাব। যাচ্ছি, ওখানকার সুপরিচিত 'অভিযান' গোষ্ঠী আয়োজিত 'বর্ধমান বইমেলা'র উদ্বোধন করতে। এখন বছরের সেই লগ্ন, যখন এখানে-ওখানে বইয়ের বেচাকেনা নিয়ে বেশখানিক সাড়াশব্দ শোনা যায়। বহু লেখক-লেখিকাই গত কয়েক মাস ধরে ঘাড় গুঁজে যা কিছু লিখেছেন, এখন এই বই-পার্বণের মুখে তৎপর প্রকাশকগণ তাদের নানা ফ্রেমে ছেপে-বেঁধে পাঠাচ্ছেন হরেক কিসিমের বইমেলায়। পরে লাভ-লোকসানের হিসেব কষতে বসবেন। তখন কারোর মুখ উজ্বল, কারোর কপালে গভীর ভাঁজ।

উদ্বোধন করতে কিন্তু আমি একা যাচ্ছি না। যুগ্মভাবে প্রদীপ জ্বালাবার কাজটি করব কথাশিল্পী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সময় ডিসেম্বর, ২০১৩।

কলকাতা থেকে বর্ধমান— দূরত্ব এমনকিছু নয়, বিশেষত আমা হেন সিন্ধুসারস ব্যক্তির নিকট। প্রথমবেলায় দমদম এয়ারপোর্টের এক নম্বর গেটে বাস ধরে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে অকুস্থলে পৌঁছে যাওয়া এবং স্বয়ংকালে বর্ধমান থেকে সল্টলেকগামী আর একটি বাস ধরে ফিরে আসা— এই তো ব্যাপার! আদত আনন্দ, তাৎপর্য তথা চিন্তার প্রক্ষেপ হলো এই যে, কালের অনুপাতে যেন এক পর্ব পার হয়ে আমি পুনরায় আমার কৈশোর ও যৌবনের একাংশকে অতিবাহিত করবার স্থান বর্ধমানে পা রাখতে চলেছি। সেই শহরকে আমি আমার মতন করে চিনতাম। নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের কুঠুরিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখিনি। আজও সেখানে পা রাখলেও নেত্রপাত মাত্র ঘটলে অনুভবে আসে স্বাধীনতা ও প্রবেশাধিকার— যা কেবল তক্তপোশে শুয়ে বসে থাকলে সম্ভব নয়।

তো সে যাই হোক, দুই সাহিত্যসেবীর হাতে উদ্বোধন হলো বর্ণময় বইমেলার নিজের স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিয়ে কিছু বক্তব্য রাখলাম। কয়েকজন বাল্যবান্ধব বহু বছর বাদে দেখা হওয়ায় আবরণহীন আবেগে জড়িয়ে ধরল। এক বিপুল বপু, প্রায় ভীষণদর্শনের ক্যামেরা কয়েকবার ঝলসে ওঠায় আমার মধ্যে কিঞ্চিৎ অস্বস্তির সঞ্চার হয়। দু'জন স্থানীয় অন্তরালবর্তী কবি গুটিপায়ে এগিয়ে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন বইমেলার ছিমছাম গর্ভগৃহে— যেখানে সস্ত্রীক সুব্রত বসে আছেন ও মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দিয়ে যেন কী বলছেন। যদিও আপাত নজরে আমি যেন ঢিলেঢালা, ভেতরে কিন্তু একটা বন্য আবেগ আমাকে টেনে নিতে চাইছে পিছনের দিকে। এই বর্ধমান শহরেরই বাণীপীঠ বয়েজ স্কুলে একদা আমি ইতিহাস পড়াতাম, এখানকার বিবেকানন্দ কলেজে কয়েকমাস অধ্যাপনা করবার পর যেন পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে ঢুকে পড়লাম ব্যাংকিং সার্ভিসে...। যদিও এই সমস্ত কার্যকলাপ হয়তো মামুলি, বিশেষত্বহীন, তবুও এই শহরে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য ফিরে এলেও যতটা সম্ভব চক্কর কেটে আসব না, তাই কী কখনও হতে পারে আমার মতন মানুষের বেলায়?

মেলাকর্তৃপক্ষের কাউকে কিছু না জানিয়ে মুখে রুমাল চেপে টুক করে বেরিয়ে পড়লাম মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে। মুহূর্তে জনতার ভিড়ে মিশে যাওয়া। শহর খুব একটা বদলেছে বলে মনে হলো না। ওই তো মিষ্টির দোকানের পাশে আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই জলসত্রটা দয়াধর্মর শর্ত মেনে। আমাকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে খুঁজে না পেয়ে বইমেলার সংগঠকরা নিশ্চয় ভ্যাবাচ্যাকা খাবেন। যখন চাঁদোয়ার তলা থেকে বেরিয়ে আসছি, তাঁরা দুই উদ্বোধকের জন্য সযত্নে সীতাভোগ ও মিহিদানার প্যাকেট সাজাচ্ছিলেন। শক্তিগড় থেকে প্রমাণ মাপের ল্যাংচাও নিশ্চয় আনা হয়েছে। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও সম্ভবত কিঞ্চিৎ বিচলিত— বলা নেই, কওয়া নেই, গেলেন কোথায় শেখরবাবু?... যে অবধি হদিশ না মিলছে, সংশ্লিষ্ট মানুষদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়বে না!

আমি তখন চারদিকটা মাপতে মাপতে হাঁটছি আর হাঁটছি। মধ্য ডিসেম্বর। চাঁদিতে তাই একটু হিমের পরশ। আবার অজস্র দু' চাকা চার চাকার গতিতে প্রভাবিত ঝাঁজালো বাতাসও দৌড়ে বেড়ায়। বর্ধমান টাউন হল, কালীবাজার, নতুনপল্লী, সর্পিল বাঁকা নদী, খৃষ্টানদের লম্বা কবরখানা ইত্যাদি পেরিয়ে আমি ঘুরপথে এসে

গেলাম কোর্ট কম্পাউন্ড এবং তখন সামনেই সদা ব্যস্ত জি. টি. রোড। চারিদিকে এমন ভিড় যেন মানুষের মাথা মানুষে খায়। যানজটে পদে পদে নাকানি-চোবানি। মনে মনে কিন্তু রচনা করে চলেছি পাতার পর পাতা মেমোয়্যার অর্থাৎ স্মৃতিকথা। বিষয়টা যখন কলমের মুখে আসবে তখন এই বর্ধমান অনেকখানি জায়গা নেবে নিশ্চিত, রাখঢাকের তোয়াক্কা করব না। পুরভোট তখনও নিছক জল্পনার স্তরে, কিন্তু নাগরিকদের মধ্যে থরহরিকম্প তোলার প্রয়াস বিলক্ষণ লক্ষণীয়। প্রচুর ছোট ছোট পতাকা আন্দোলিত, তৎসহ শ্লোগানের কাটাকুটি তথা 'নেতা'দের মুখনিঃসৃত ভব্যতা লঙ্ঘনকারী বিষোদ্গার কমবেশি নাভিশ্বাস তোলার পক্ষে পর্যাপ্ত।

আমি যেন একটু হন্তদন্ত হয়েই হাঁটছিলাম। মুখ পুরোপুরি ওপরের দিকে তুলতেই দেখতে পেলাম শহর বর্ধমানের অন্যতম দর্শনীয় ঐতিহাসিক নির্মাণ কার্জনগেট। অনেক কাছাকাছি চলে এসেছি। জি.টি. রোডটুকু পার হয়ে একবার ছুঁয়ে আসতে পারি সাবেক রোমক গথিক রীতির গ্ল্যামারাস নিদর্শনটিকে। কাল ওকে দীর্ঘ পরমায়ু মঞ্জুর করেছে। নিশ্চয় আরও কয়েক শতাব্দী এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। উচ্চতা অনেক। বিভিন্ন বয়সী অনেক মানুষ যেন একরকম ঘিরে ফেলেছে গেটটাকে। কিসের উল্লাস, কিসের হুল্লোড় প্রথমে বুঝিনি। তবে ভিড়ের মধ্যমণিকে চেনা গেল। লোক্যাল লিডার। গাঢ় সবুজ রঙের ঢলঢলে পাঞ্জাবি এবং জিনসের প্যান্ট। অনুগামীরা তাঁর নির্দেশ পেয়ে মহা বিন্দাস।

একটা কঠিন ও জটিল কাজকে শেষ করতে হাইপার অ্যাকটিভ। আমারও অন্বেষণী মানসিকতা তখন মাথাচাড়া দেয়। ক্ষণকালে জি.টি. রোড পার হয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াই সুউচ্চ কার্জনগেটের বাঁ দিকটায়। ক্যাডারদের রূঢ় ঠাঁটে বিব্রত এক পলিতকেশ ডাবওয়ালা আপন পশরা সরাতে যেন সুড়ঙ্গের খোঁজ করছেন। আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় একখানা মস্ত কাটআউটের ওপর। জাজিমের মতন পুরু পিসবোর্ডের ওর সযত্নে সাঁটা হয়েছে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ছবি— মৃদু হাস্য সমেত বিনীত নমস্কার। ছবির এককোণে আরও একজন, যাকে শনাক্ত করতে পারছি না— চেহারায় ঈষৎ নাড়ুগোপাল, মোঙ্গলীয় অবয়ব। তিলমাত্র সন্দেহ নেই, তিনি একজন স্থানীয় বিশিষ্ট নেতা।

সবুজ পাঞ্জাবি পরিহিত ব্যক্তির কথা শুনে বুঝলাম, এঁরা এই ১৫/১৬ ফিটের কাটআউটটিকে কার্জনগেটের শীর্ষে স্থাপন করবার কথা ভাবছেন। যতই কৌতূহল থাকুক, আমি বরাবর নির্বিরোধ, ভোলেভালা মানুষ। কোনো ব্যাপারেই খুব একটা উচ্চবাচ্য করাটা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। যথাসম্ভব সদ্ভাব রেখে সাত দশক ধরে নাগরিকজীবন কাটিয়ে দিলাম।

তবুও কৌতূহলের কামড় সহ্য না করতে পেরে সবুজ পাঞ্জাবিকে বলে বসলাম, 'কাটআউটটাকে কী একেবারে কার্জনগেটের মাথায় তুলতে চান?' সঙ্গে সঙ্গে রণদামামা বেজে ওঠে, 'আপনার তাতে আপত্তি আছে নাকি?' ফলে আমিও যেন শীতে কোঁকড়ানো বালাপোশ জড়ানো লোক, 'অত উঁচুতে কী তোলা যাবে?'

তাঁর চোখে তখনও ব্যাঘ্রদৃষ্টি, 'আলবত যাবে। শত্রুর মুখে নুড়ো জ্বেলে আমরা এভাবেই এ শহরের সবচেয়ে উঁচু মিনারের ওপর দিদিকে স্থাপন করব। কার্জনগেটের যে উচ্চতা ও গৌরব, আমাদের কাছে দিদিরও সেই উচ্চতা ও গৌরব।'

আমাকে বুঝি এক গোর্খার কুকরি এসে আঘাত হানে। এই তেরিয়াভাব মানুষটি কী বলছেন! কিন্তু ওঁর ভুল ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে গেলে হেনস্থা হতে হবে না তো? আমার অধরোষ্ঠ কাঁপে। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, 'স্যার, কার্জনগেট খুব উঁচু, খুব সুন্দর। কিন্তু এর ইতিহাসে কালির দাগ আছে।'

দেখলাম, নেতা আমার কথা শুনতে আগ্রহী। তার এক চেলাও এসে দাঁড়িয়ে সামনাসামনি। চেলার মুখভর্তি বিনুনি করা দাড়ি, দুই বাহু যেন মুগুর। আমি যথাসম্ভব নরম গলায় বলে চলেছি, 'লর্ড কার্জন তখন বড়লাট। কলকাতা ভারতের রাজধানী। বাবু ও জনাকয়েক জমিদারের লারে-লাপ্পা জীবনযাপন অব্যাহত থাকলেও ইংরেজদের তখন প্রধান লক্ষই ছিল বাঙালি জাতির কোমর ভেঙে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যেই ১৯০৫ সালে কার্জন প্রথম বাংলাকে দু' টুকরো করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন ও ধিক্কারে তুমুলভাবে জেগে ওঠে তামাম বাংলা। আর সেই কার্জনকেই কিনা বর্ধমানে পা রাখতে সকাতর অনুরোধ জানালেন বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাব। বড়লাটও প্রায় লুফে নিলেন ওই আমন্ত্রণ। কার্জনের মন ভরাতে তথা মান বাড়াতে বর্ধমানের মহারাজা দু'টি কালজয়ী বস্তু নিয়ে এলেন বর্ধমানের জমিতে। এক নম্বর— সীতাভোগ ও মিহিদানা; দু' নম্বর— এই সুউচ্চ মিনার কার্জনগেট। কামিনী আতপচালের গুঁড়োয় সবেদা, চিনি, ছানা মিশিয়ে গাওয়া ঘিতে ভেসে রসে ভিজিয়ে সীতাভোগ তৈরি হলো। পাশাপাশি ডালের গুঁড়ো ঘিতে ভেসে রসে ভিজিয়ে হলুদ মিহিদানা। অতি দ্রুততায় অনন্য নিপুণতার সঙ্গে নির্মিত হলো কার্জনগেটও। গণধিক্কারে বিব্রত কার্জন এলেন এখানে। এই তোরণের তলায় বসে সীতাভোগ ও মিহিদানার স্বাদ নিলেন এবং মৌজে ধূমপানও করলেন।

আপনারা কী দিদিকে ওই গরিমাই দিতে চান কার্জনগেটের মাথায় তাঁর বিশাল কাটআউট বসিয়ে?'

আর বলা হলো না।

আমার মোবাইলে গায়ত্রী জপ।

মেলা কর্তৃপক্ষ আর ধৈর্য রাখতে পারছেন না।

আমাকে এখুনি যেতে হবে। ■

পিতৃহীন মেয়েদের পিতা মহেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আজকের সমাজে মানুষ স্বার্থ ছাড়া এক পাও হাঁটেন না। এরই মধ্যে এমন কোনো ব্যতিক্রমী চরিত্র আছেন যাঁরা সমাজের বিভিন্ন কাজে নিঃস্বার্থভাবে ভালো কাজ করার প্রয়াস চালিয়ে যান। যাঁদের কার্যসিদ্ধির পিছনে কোনো উদ্দেশ্য কাজ করে না। এমনই এক ব্যক্তি হলেন মহেশ সাওয়ানি।

আমরা ভাবি যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন। কিন্তু যার বাবা নেই? —সাত পাঁচ চিন্তা না করে সুরাটবাসী যে কোনো ব্যক্তি এক কথায় বলে বসবেন— 'তার মহেশ সাওয়ানি আছেন'। গুজরাটের আমেদাবাদ থেকে প্রায় ২৬৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সুরাট নামক স্থানে পিতৃহীন দরিদ্র্য কন্যাদায়গ্রস্থ পরিবারের পাশে খুঁটি হয়ে দাঁড়ান মহেশ সাওয়ানি। পিতৃহীন কন্যাদের গণবিবাহের মাধ্যমে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার বন্দোবস্ত করেন তিনি। তবে হঠাৎ এই ধরনের সমাজসেবা করার চিন্তা মাথায় তো তাঁর আসেনি? মহেশ সাওয়ানির কথায় জানা যায়, দুই কন্যার বিবাহের বারোদিন আগে তাঁর অফিসের এক কর্মীর মৃত্যু হয়। খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় এই পরিবারকে। এই সময় তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বিয়েতে বাবার অভাব পুরণ করেন তিনি। বিবাহ দেওয়ার পর তিনি মনস্থির করেন আগামীদিনে তিনি এইরকম আরো বিবাহ দেবেন। সেই থেকেই তাঁর এই ধরনের সমাজসেবা করা চালু হয়। আজ পর্যন্ত তিনি ১১১টি বিবাহযোগ্য পিতৃহীন কন্যার বিবাহ দিয়েছেন। বিবাহের পর প্রতিটি নবদম্পতিকে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার নগদ টাকা, সোনা-রুপার গহনা, সঙ্গে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, জামা-কাপড়, বাসনপত্র সঙ্গে নানানরকম সামগ্রী দিয়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠান।

২০০৭ সাল থেকে গণবিবাহ দিয়ে আসছেন মহেশ সাওয়ানি। ৪৫ বছর বয়সী মহেশ সাওয়ানি পেশায় একজন রিয়েল এস্টেট এবং হিরে ব্যবসায়ী। এছাড়াও পাঁচটি স্কুল এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসা সম্বলিত একটি হাসপাতালের মালিকও তিনি। তাই সুরাটের পি.পি. সাওয়ানি গ্রুপের নাম এককথায় সবাই জানেন। সাওয়ানি গ্রুপ তিনদিনের যে গণবিবাহ অনুষ্ঠান করে থাকে স্থানীয় ভাষায় যার নাম 'লগানা নু বাবেতার'।

নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করছেন সস্ত্রীক মহেশ সাওয়ানি।

১১১টি বিবাহ দিতে মহেশ সাওয়ানি খরচ করেছেন ৬০ মিলিয়ন অর্থাৎ ৬ কোটি টাকা। তিন দিনের এই গণবিবাহ অনুষ্ঠানে অতিথি সমাগম হয় প্রচুর পরিমাণে। প্রায় ৭০ হাজার অতিথির জন্য ব্যবস্থা থাকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গফুটের প্যান্ডেল। তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে সুরাটের আবরামা অঞ্চল জাকজমকপূর্ণ চেহারার আকার নেয়। যা দেখে বিবাহের পিঁড়িতে বসার আগে কোনো মেয়ের মনেই হবে না সে পিতৃহীন। মহেশ সাওয়ানি এই অনুষ্ঠানে কোনো ভাবেই কোনোরকম ত্রুটি-বিচ্যুতি রাখতে চান না। রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আনন্দীবেন প্যাটেলকেও এই বিবাহে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে নবদম্পতিদের আশীর্বাদ করেন। এই গণবিবাহে ধর্ম-জাতি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনদের পাশাপাশি মুসলমান মেয়েদের বিবাহও দিয়েছেন। নিজ নিজ ধর্মের রীতিনীতি মেনে যেভাবে বিবাহ হয় সেই মতোই এখানেও বিবাহ হয়ে থাকে। সাওয়ানি বলেন, ''আমি এমন কিছু মেয়েকে দেখেছি যারা বিবাহ করতে চায় কিন্তু তাদের বাবা না থাকায় বিবাহের আয়োজন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমি তাদের অবস্থা বুঝেছি। তাই আমি এই সমস্ত পিতৃহীন মেয়েদের বাবা হয়ে উঠেছি। এটাই আমার পথ তাদের সাহায্য করার। আমি কন্যাদান করতে পেরে খুবই গর্বিত।''

এই গণবিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহেশ যে কাজ করে চলেছেন তার জন্য তার নাম গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ উঠেছে। মহেশ কন্যাদান করেছেন এমন একজন কন্যা মিতালি নারোলা।

২০০৯ সালে পিতৃবিয়োগ হয় মিতালির। এরপর মহেশই তার বিবাহ দেন। কথায় কথায় মিতালি জানান, ''সাওয়ানি আমার কাছে এবং আমার ভাই বোনেদের কাছে পিতৃতুল্য। ভগবানকে ধন্যবাদ।'' শৈশবেই বাবাকে হারিয়েছে নাহেদা বানু। পরবর্তীকালে আরিফের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর তাঁর কথা, ''মহেশজী আমার কাছে একজন বাবা। তিনি সবসময় আমাদের সঙ্গে আছেন, থাকবেন। আল্লা যেন তাঁকে ভালো রাখেন।''

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

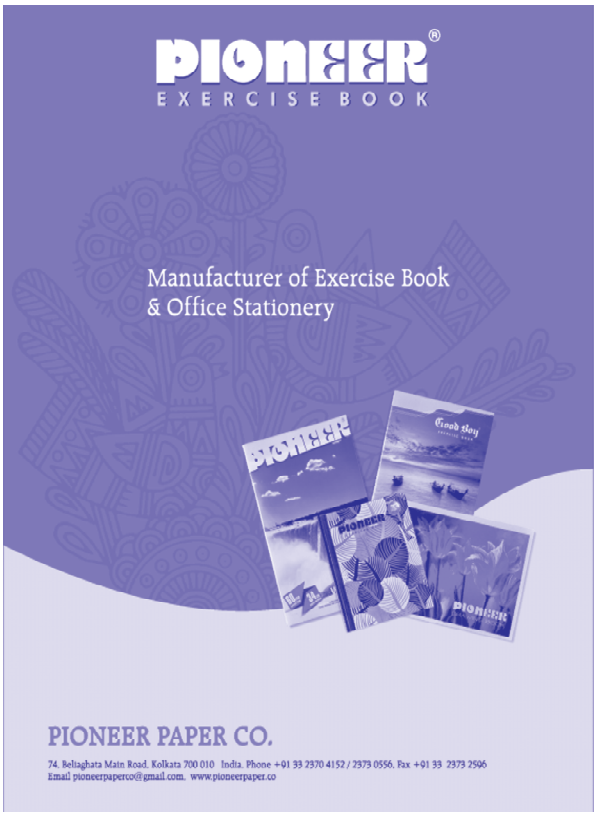

" নৈতিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের সকল প্রশ্নের সমাধানে পুরুষ অপেক্ষা নারীর গুরুত্ব অনেক বেশি। নারীরই প্রযত্নে জীবনের সামঞ্জস্য বিহিত হয়। গৃহধর্ম যেমন নারীর নির্দেশে চলে, পুরুষ নিশ্চিন্ত মনে অর্থোপার্জনে মন দেয়, তেমনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে কিরূপ জীবন গঠন করা উচিত, এ বিষয়েও নারীরই ধারণা জগৎকে পরিচালনা করে এবং নূতন জগৎ সৃষ্টি হয়। "

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ইয়েমেন সঙ্কট

শিয়া সুন্নির কর্তৃত্ব দখলের লড়াই

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

সম্প্রতি ইয়েমেনে অবরুদ্ধ রাষ্ট্রপতি, আবেদাব্বে মনসুর হাদিকে সমর্থন করে সৌদি আরবের নেতৃত্বে সহযোগী আরবদেশগুলি ইয়েমেনের উপর বিমান হানা এবং নৌ-গোলাবর্ষণ করে চলেছে। অন্যদিকে ইরান সমর্থিত হুথি শিয়াসম্প্রদায়ের বিদ্রোহীরা রাজধানী সানা দখল করে দেশকে ছারখার করে দেবার হুমকি দিয়েছে যার জেরে বর্তমান রাষ্ট্রপতি মনসুর হাদি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। সৌদিরা সুকৌশলে এঘটনাকে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব কায়েম করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সুন্নিদের প্রতিরোধ বলে তুলে ধরতে চাইছে। শিয়া-সুন্নি লড়াই-এর এটাই প্রচলিত লোকগাথা। কিন্তু মাঝেমধ্যেই এই লোকগাথাগুলি বাস্তবে এমন জীবন্ত হয়ে অভিনীত হয় যে সেগুলি আরও একবার সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে বাস্তবে যা ঘটেছে তাকে শুধু শিয়া-সুন্নির চিরাচরিত দ্বন্দ্ব বললে সেটা ঘটনার অতিসরলীকরণ হয়ে যায়। কথাগুলো কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে যে, শিয়া-সুন্নির এই দ্বন্দ্ব এতদঞ্চলে রাজ-রাজড়াদের কাছে যতটা না জটিল, ইয়েমেনে তার থেকে বেশি জটিল এবং বিভ্রান্তিকর।

সিরিয়ার পরিস্থিতি পশ্চিম এশিয়ার প্রচলিত এই জটিলতারই অংশবিশেষ। সেখানে ইসলামিক স্টেট (DAESH-ইসলামিক স্টেটের আরবিয় সংক্ষিপ্ত রূপ)-এর কার্যকলাপ বন্ধ হোক এটা আমেরিকা এবং আসাদ উভয়েই চায়। বস্তুত, আমেরিকার কাছে আল কায়দার থেকেও DAESH একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আমেরিকা এ ব্যাপারে আসাদকে সাহায্য করতে চায় না, কারণ সৌদি চায় না যে সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি আসাদ ক্ষমতায় থাকুক। আসাদ যেহেতু ইরানের মিত্র, সেকারণে সৌদিরা তাঁকে জাতশত্রু মনে করে। যে সময় আমেরিকা-ইরান পরমাণু চুক্তি প্রায় শেষের মুখে থাকে ইরান আমেরিকার সঙ্গে বৈরিতার অবসান হলো বলে ভাবছে, ঠিক সেই সময় আমেরিকা সৌদির সঙ্গে বিচ্ছেদ চায় না। সিরিয়া এবং ইরাকে ব্যাপারটা এরকম যে, শত্রুর শত্রু মিত্র নয়, বরং শত্রু। ইয়েমেনের ব্যাপারটা তুলনায় অনেক বেশি জটিল।

ইয়েমেনের শিয়া বিদ্রোহীরা।

ইয়েমেন সঙ্কটের সূত্রপাতের কারণ :

উত্তর ইয়েমেনে সম্প্রতি সরকার-বিরোধী হুদি সম্প্রদায়ের উত্থানের সূত্রপাত হয়েছিল যখন সেখানে পূর্বতন রাষ্ট্রপতি, আলি আবদুল্লাহ সালেহ্ ক্ষমতায় ছিলেন। সালেহ্ একজন হীন এবং চরম দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁর পেছনে আমেরিকার মতো কিছু বিদেশি শক্তির মদত ছিল। ইয়েমেনের মাটিকে আলকায়দার বিরুদ্ধে ড্রোন হানার জন্য ব্যবহার করতে দেবার বিনিময়ে আমেরিকা তাঁকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিত। সালেহ্ এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি হাদির মতো হুথিরাও জাইদি শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। পয়গম্বর মহম্মদের উত্তরাধিকার নিয়ে ইরানিদের সঙ্গে জাইদিদের মতপার্থক্য আছে। ইরানিরা মনে করেন যে, মহম্মদের ১২ জন উত্তরাধিকারী আছেন যাঁদের মধ্যে তাঁরা দ্বাদশতম শিয়া সম্প্রদায়ের অন্যদিকে জাইদিরা প্রথম পাঁচজন খলিফাকেই আনুগত্য দেখান যার পঞ্চমতম বংশধর তাঁরা। উভয় সম্প্রদায়ই একে অন্যকে বিধর্মী মনে করে। পঞ্চমতম বংশধররা সুন্নিদের খুব কাছের এবং তারা ইয়েমেনে সুন্নিদের সঙ্গে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এড়িয়ে শতকের পর শতক বসবাস করছে। ১৯৬০ সালে গৃহযুদ্ধের সময় ইজিপ্টের রাষ্ট্রপতি নাসেরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আরব জাতীয়তাবাদ আরব দুনিয়ায় কর্তৃত্ব কায়েম করে। নাসের ছিলেন উত্তর ইয়েমেনের হুথি সম্প্রদায়ের একজন ইমাম এবং উত্তরাধিকার সূত্রে শাসক, দক্ষিণ ইয়েমেনের ইজিপ্ট সমর্থিত 'আধুনিকপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী' শক্তির বিরুদ্ধে তাঁকে সামরিক সাহায্য করতো সৌদি। একটা সময়ে ইজিপ্টের ৭০ হাজার সৈন্যসামন্ত ইয়েমেনে যুদ্ধ করতো, যা ইজিপ্টের সেনাবাহিনীর প্রায় একতৃতীয়াংশ। ইজরায়েলের সাঁড়াশি আক্রমণের কাছে ইজিপ্ট, জর্ডন এবং সিরিয়ার আরব সৈন্যদল ১৯৬৭ সালে

পরাজিত হয় যার ফলে ১৯৬৮ সালে ইজিপ্টের বাহিনী ইয়েমেন থেকে প্রত্যাহার করা হয়। শেষমেষ শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ৬০০ বছরের পুরোনো অশান্তির অবসান হয় এবং ইয়েমেন গণতন্ত্র আত্মপ্রকাশ করে।

ঘটনার নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যখন নির্বাসিত রাষ্ট্রপতি সালেহ্ হুথিদের কাছে পৌঁছে যান এবং ইয়েমেনের সেনাবাহিনী থেকে তাঁর সমর্থক জোগাড় করে হাদির বিরুদ্ধে একটি যৌথ ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের (ইউ এন) প্রতিবেদন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে সালেহ্ আলকায়দার সঙ্গে রফা করেন যে, সায়বান প্রদেশ তাদের দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে করে আলকায়দার ভয় দেখিয়ে তিনি আমেরিকার কাছ থেকে বেশিমাত্রায় সমর্থন আদায় করতে পারেন। এখন ব্যাপারটা এরকম যে, ইয়েমেনে আমেরিকা, আলকায়দা, সৌদি এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, ইজিপ্ট, কুয়েত, ওমান প্রভৃতির মত সৌদির সুন্নি আরব মিত্রপক্ষ ঢুকে পড়েছে। এমনকী সামগোত্রীয়দের সমর্থন নিয়ে ইরানও এই ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি হুথিদের অস্ত্রশস্ত্র, আক্রমণের রাস্তা ইত্যাদি দিয়ে ইরান সাহায্য করছে। আর এরাই হলো সৌদিচালিত হস্তক্ষেপকারীদের আক্রমণের লক্ষ্য। ইজিপ্টে মুসলমান ভ্রাতৃত্বের প্রতীক, গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মরসীকে সশস্ত্র সেনাবাহিনী যেভাবে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা ইজিপ্টের উপর সামরিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এতে ইজিপ্ট রাজনৈতিকভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে এবং তাদের আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই ইজিপ্ট সৌদি আরবের সাহায্যপ্রার্থী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সেই সুযোগে সৌদি এবং সমগোত্রীয় তেল উৎপাদক আরব দেশগুলি ইজিপ্টকে বাঁচাতে প্রচুর অর্থসাহায্য নিয়ে ছুটে যায়। এবার সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে আমেরিকা সরাসরি সৌদি হস্তক্ষেপকারীদের সমর্থন করল।

এই অস্বাভাবিক জোটে কাতারের অংশগ্রহণ রীতিমতো আশ্চর্যজনক। কাতার যেখানে আলকায়দা, তালিবান, হামাস ইত্যাদির মতো মৌলবাদী উগ্রপন্থীদের সমর্থন দেওয়া সৌদি এবং তার মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে লড়ে আসছে, সেখানে নাদির ইজিপ্টের রাষ্ট্রপতি মরসীর ক্ষমতাচ্যুতিতে সহমত পোষণ করার জন্য ইরানকে তাদের শত্রু ভেবে তাকে পর্যুদস্ত করার চিন্তা করছে। একইরকম চিন্তাভাবনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সিরিয়ার ক্ষেত্রেও। 'সমরসজ্জিত' পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে ইয়েমেনে বিদেশি শক্তির ভূমিকার আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পাকিস্তান নিজেকে পরমাণু শক্তিধর কাফেরদের হাত থেকে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর একমাত্র রক্ষক বলে মনে করে। লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানি আরব দুনিয়ায় কাজ করে প্রচুর অর্থ পাঠায় যা থেকে পাকিস্তান রমরমিয়ে চলে। সৌদি রাজপুত্ররা পাকিস্তানে বিরল ও সংরক্ষিত জীবজন্তু শিকার করতে এলে তাদের ক্ষেত্রে দেশী নিয়মকানুন খাটে না। মুসারফের কারাগার থেকে মুক্তি পাবার জন্য নওয়াজ শরিফ সৌদি মধ্যস্থতাকারীদের কাছে কৃতজ্ঞ। সৌদি আরবই একসময় নওয়াজকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল, আবার তাদের ইচ্ছেতেই মুসারফ এবং আমেরিকাকে নস্যাৎ করে তিনি পাক রাজনীতিতে পুনরায় প্রবেশ করেছেন। সুতরাং একজন পর্যবেক্ষক যখন পাকসেনাবাহিনীকে 'ভাড়াটে সেনাবাহিনী' এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানকে একটি 'ভাড়াটে রাষ্ট্র' বলেছিলেন, তার মধ্যে অবাক হবার মতো কিছু ছিল না। তথাপি ইরানের ব্যাপারে সরাসরি নাকগলানো পাকিস্তানের পক্ষে একটু অসুবিধাজনক। দুটি দেশের মধ্যে একটি দীর্ঘ অশান্ত সীমারেখা রয়েছে এবং পাকজনসংখ্যার ২০ শতাংশ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। পাকসেনার উদ্যোগে গড়ে ওঠা লস্কর-ই-তৈবা শিয়া-সুন্নির এই ঝগড়ায় ঢুকতে চায় না, যদিও অন্যান্য সুন্নি সন্ত্রাসবাদীদের সরাসরি আক্রমণের লক্ষ্য শিয়াগোষ্ঠী। পাক শিয়াগোষ্ঠী নৈতিক সমর্থনের জন্য ইরানের দিকে তাকিয়ে আছে। বস্তুত ইরান, পাকিস্তানে গা-ঢাকা দেওয়া রাষ্ট্রবিরোধী জুনদুল্লাহ-এর সক্রিয় কর্মীদের অপহরণ করার জন্য পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তাদের গুপ্তচর বাহিনীকে ঢুকিয়ে রেখেছে। উত্তরে সৌদির দিকে হুথিদের আক্রমণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না, বরং তাদের কর্মসূচি সম্পূর্ণভাবেই তাদের দেশসংক্রান্ত। এতকাল যে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল, তারা চাইছে ইয়েমেনের অংশীভূত হতে।

সাম্প্রতিক এই অভ্যুত্থান, বিশেষ করে সৌদির নেতৃত্বে একতরফা হস্তক্ষেপের নেপথ্যে কি কারণ রয়েছে? এই দ্বন্দ্বের ফলে শেষ পর্যন্ত লোহিত সাগরে জাহাজ পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যহত হতে পারে, তা নিয়ে সৌদির মাথাব্যথা না হয় কিছুটা বোঝা গেল। কিন্তু আরবিয়রা বুঝতে পারছে যে এই দ্বন্দ্বের পেছনে কোনো সামরিক সিদ্ধান্ত বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। কাতার ইয়েমেনের যুযুধান সব পক্ষকে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে যা হুথিরা অস্বীকার করেনি। এই পরিস্থিতিতে, ইরান হুথিদের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করতে পারে এবং সৌদিও ইরানের পরমাণু চুক্তি নিয়ে সুর নরম করতে পারে। DAESH-এর কাজকর্ম কিছুটা প্রশমিত হলেই তারা, আসাদের সঙ্গে সমঝোতার পথে আসতে পারে।

বর্তমানে ইরান শুধুমাত্র DAESH- এর বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে। সর্বোপরি, ইরানের পরমাণু চুক্তি কোনোভাবেই তাদের সামরিক ক্ষমতা কমাবে না, বরং এর ফলে পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে অনেকেই এরকম সমঝোতার পথে হাঁটবে।

এখন প্রশ্ন হলো যে, সম্ভাব্য এই নতুন সমীকরণ থেকে ভারত লাভ তুলতে পারবে কি? বিশেষ করে তার অর্থনীতি ও বিদেশনীতির সঙ্গে খাপ খায়, যেমন জ্বালানি তেলের দাম কমা বা ভারতীয় উদ্যোগপতিদের ব্যবসা বাড়ানোর সুযোগ অথবা ভারতীয় শ্রমিকদের বেশি কাজের সুযোগ ইত্যাদি ব্যাপারে সুবিধা করতে পারবে কি? পরিষ্কারভাবে, ভারতের উচিত ইরান, সৌদি আরব, আরবের অন্যান্য তেল উৎপাদক দেশ এবং এর সঙ্গে স্বার্থজড়িত বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্ক বাড়ানো, যাতে পশ্চিম এশিয়ার এই পুনর্বিন্যাস থেকে ভারত যথাসম্ভব সুবিধা নিতে পারে এবং এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ■

দিনহাটায় সারদা শিশুতীর্থের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ১ মে কোচবিহার জেলার দিনহাটায় মদনমোহন পাড়া সারদা শিশুতীর্থের রজত জয়ন্তী বর্ষে নবনির্মিত ভবন 'কেশবতীর্থ'-এর দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান কোচবিহার রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণব্রহ্মানন্দ মহারাজের হাতে সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের সভাপতি বিশ্বনাথ গরাই, বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের সম্পাদক পরিমল রায় কোঙার, সারদা শিশুতীর্থের গৃহনির্মাণ সমিতির সভাপতি প্রসন্ন কুমার রায়, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি তরুণ কুমার সান্যাল প্রমুখ। বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন, বৃক্ষরোপণ, দ্বারোদ্ঘাটন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন গৃহনির্মাণ সমিতির সভাপতি প্রসন্ন কুমার রায়। মূল সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলন ও মাতৃবন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিদ্যালয়ের সভাপতি উত্তরীয় ও শিক্ষার্থীরা ফুলের তোড়া ও ব্যাজ পরিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে বিদ্যালয়ের মাসিমণি শ্রীমতী রংমালা বর্মন বিদ্যালয় ভবনের উন্নয়নে দশ হাজার এক টাকা সভাপতির হাতে তুলে দেন। বিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য উত্তম রায় বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ও নেপালের ভূমিকম্পে দুঃস্থদের পাশে সকলকে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

ফলতায় দূষণমুক্ত গঙ্গা সুচেতক সম্মেলন

গত ২৬ এপ্রিল গঙ্গা সমগ্রের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতায় দূষণমুক্ত গঙ্গা সুচেতক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন ও গঙ্গামাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে সম্মেলনের সূচনা করেন বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সভাপতি গোপাল চন্দ্র হালদার। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ কার্যবাহ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে গঙ্গার প্রভাবের কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন শিক্ষক রোহিতাশ্ব সরদার, অটলকুমার পুরকাইত, দেবদাস মণ্ডল, গৌতম প্রামাণিক প্রমুখ। সন্ধ্যায় শোভাযাত্রা সহকারে মূল মঞ্চ থেকে গঙ্গাতীরে যাওয়া হয়। সেখানে সন্ধ্যারতি ও গঙ্গাবন্দনার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন গঙ্গা সমগ্রের গঙ্গাসাগর জেলা প্রমুখ পার্থ হালদার ও অমরেশ মুখোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে গণবিবাহ

গত ১০ মে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে শিলিগুড়ির শালবাড়ি এলাকার বিরসা শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে বনবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে গণবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। রীতি মেনে মোট ১০১ জন দম্পতির বিবাহ হয় অনুষ্ঠানে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পক্ষ থেকে নবদম্পতিকে নিত্য প্রয়োজনীয় উপহার সামগ্রী সমেত যৌতুক দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ এস. এস. আলুওয়ালিয়া এবং স্থানীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট জোনাল ম্যানেজার। গণবিবাহ অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। জনজাতি সম্প্রদায়ের এই বিবাহ অনুষ্ঠানের তারা পরম্পরাগত পোশাক এবং ব্যান্ডের তালে নৃত্যগীতে মেতে ওঠে। তবে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের এই উদ্যোগ প্রথম নয়। বহু দিন থেকে অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম বনবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম সামাজিক অনুষ্ঠান করে আসছে।

পরলোকে রথীন্দ্রনাথ দাস

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার সহ সেবাপ্রমুখ রথীন্দ্রনাথ দাস গত ১ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। তিনি ১৯৮৬ সালে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্ঘের নানা ছোটবড় দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের জেলা সদস্য ও আরোগ্যমিত্র প্রমুখের দায়িত্বও পালন করেছেন। এক কথায় তিনি গোকর্ণ এলাকায় সঙ্ঘকাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তিনি ২ ভাই, ৫ বোন ও ভাইপো-ভাইঝি এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। গত ৫ মে সন্ধ্যায় তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ

বহু বিশিষ্ট কার্যকর্তার উপস্থিতিতে গত ৩ মে নকশালবাড়ি সারদা শিশুতীর্থ বিদ্যালয় পরিসরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ আরম্ভ হয়। ভারতমাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে বর্গের শুভারম্ভ করেন সঙ্ঘের অন্যতম সহ-সরকার্যবাহ ভাগাইয়াজী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উত্তরবঙ্গ পেট্রল ডিলার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্যামল পালচৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক প্রমুখ রমাপদ পাল, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ চন্দ্র অধিকারী, শিলিগুড়ি বিভাগ সহ-সঙ্ঘচালক কুলছত্রপ্রসাদ আগরওয়াল, প্রান্ত প্রচারক জলধর মাহাতো সহ-বিশিষ্ট কার্যকর্তাবৃন্দ। প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী উপস্থিত কার্যকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

কুড়ি দিনের এই বর্গে উত্তরবঙ্গের ১০৬ স্থান থেকে ১৪৮ জন শিক্ষার্থী যোগ দিয়েছেন। বর্গ ১৪ মে সকাল পর্যন্ত চলবে। বর্গাধিকারী হিসেবে রয়েছেন বালুরঘাট নগর সঙ্ঘচালক বিমলেন্দু দাস। এই বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ও শিলিগুড়ি জেলা কার্যবাহ সুজিত দাস রয়েছেন বর্গ কার্যবাহ হিসেবে এবং মুখ্যশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন উত্তর দিনাজপুর জেলা ঘোষ প্রমুখ চিত্তরঞ্জন মণ্ডল।

গত ৭ মে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের একটি সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ শুরু হয় হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরে। এই বর্গে শুধুমাত্র স্কুল, কলেজর ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেছেন। বর্গাধিকারীরূপে রয়েছেন কাঁথি জেলা সঙ্ঘচালক অসিত খামারি, বর্গকার্যবাহ পুরুলিয়া সহজেলা কার্যবাহ রাজেন্দ্রনাথ মাহাতো। মুখ্যশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন নদীয়া জেলা প্রচারক কর্ণধর দে এবং বৌদ্ধিক প্রমুখ হিসেবে রয়েছেন বীরভূম বিভাগ প্রচারক দেবাশিস অধিকারী। বর্গের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুলকুমার বিশ্বাস এবং প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। উল্লেখ্য, দক্ষিণবঙ্গে উপার্জনশীল স্বয়ংসেবকদের নিয়ে গত ১৭ মে মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজারে একটি প্রথম বর্ষ বর্গ এবং দুই বঙ্গের মিলিত একটি বিশেষ বর্গ ফারাক্কায় শুরু হয়েছে।

পূর্বক্ষেত্রের দ্বিতীয়বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ ওড়িশার অনগুলে গত ১০ মে থেকে শুরু হয়েছে। তাতে উত্তরবঙ্গের ৩৩, দক্ষিণবঙ্গের ৭২ এবং উৎকলপ্রান্তের ৫১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ধ্রুবজ্যোতি দাশগুপ্ত গত ১০ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। বেশ কয়েক বছর তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থ ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ৮০ সালে অবসর গ্রহণের পর বাণপ্রস্থী কার্যকর্তা রূপে নিজেকে সমর্পণ করেন। প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ, প্রান্ত সেবাপ্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। শেষ সময়ে তিনি বর্ধমানে তাঁর ভাইয়ের কাছে ছিলেন। ভাইয়ের বাড়িতে পরলোকগমন করেন।

***

গত ৪ মে কলকাতা বেহালার প্রবীণ স্বয়ংসেবক অশোক রায়ের মাতৃদেবী বীণাপাণি রায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ১ পুত্র, নাতিনাতনি ও অসংখ্য গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, কয়েকবছর আগে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রয়াত হন।

***

বাঁকুড়া জেলার খাতড়ার স্বয়ংসেবক অচ্যুতানন্দ ঘোষের মাতৃদেবী শক্তিবালা দাসী গত ২১ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি ৪ পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

কলকাতা মধ্যভাগের বীরেশ্বর প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক শিলাদিত্য ভট্টাচার্য, প্রতাপ ভট্টাচার্য ও পবিত্র ভট্টাচার্যের ঠাকুমা সাধনা ভট্টাচার্য গত ২৯ এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার খড়শী গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ৪ কন্যা, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

***

বাঁকুড়া জেলার মণ্ডলকুলি শাখার স্বয়ংসেবক তথা ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রাদেশিক সম্পাদক অরুণ কুমার মণ্ডলের মাতৃদেবী অম্বালিকা মণ্ডল গত ৮ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

Swastika

The Nationalist Bengali News Weekly
Published on every Monday

ADVERTISEMENT TARIFF

Back Cover (Multi Colour) -	Rs.	32,000.00
Front Inside (Multi Colour) -	Rs.	25,000.00
Back Inside (Multi Colour) -	Rs.	25,000.00
Full Page (Multi Colour) -	Rs.	20,000.00
Full Page (Black/White) -	Rs.	15,000.00
Half Page (Black/White) -	Rs.	8,000.00
Qtr. Page (Black/White) -	Rs.	4,000.00

MECHANICAL DETAILS

Width of a col. 7.7 cms.
Length of a col. 23 cms.
Size of printed page 23 X 16
Overall size 26 X 19
Columns per page 2

MATERIALS REQUIRED

PDF / Tiff File (CMYK) for colour
Artpull for Black & White

27/1B, Bidhan Sarani,
Kolkata– 700 006.
M : 9874080343, Phone : 033-22415915
e-mail : swastika5915@gmail.com, web. : eswastika.com
Cheque/D.D should be drawn in favour of SWASTIKA.

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana®
SAREES

Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমার পালের
ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

শব্দরূপ-৭৪৭ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

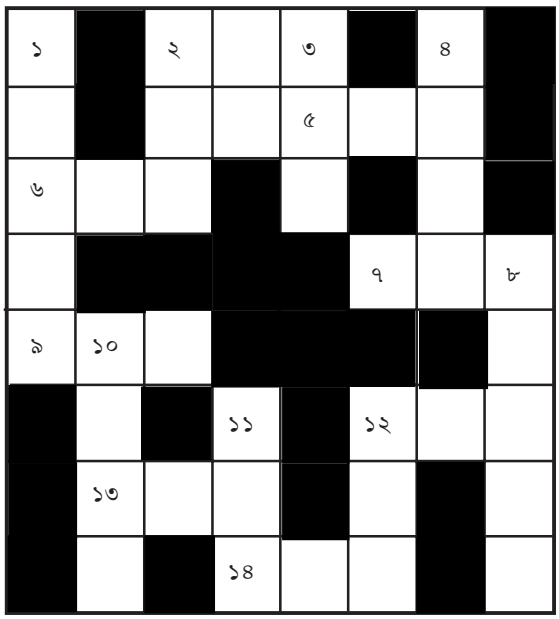

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. জেল্লা, ঔজ্জ্বল্য, ৫. জানালা, ৬. রসিকা, ৭. হায়দ্রাবাদের রাজার উপাধি, ৯. ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত সত্যকাম জননী, ১২. সমবয়সী বন্ধু, সখা, ১৩. আলখাল্লা, প্রথম দু'য়ে হুড়কা বা কীলক, ১৪. রাধিকার সখী বিশেষ।

উপর-নীচ : ১. পারদগন্ধক ঘটিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ, মীনকেতন, ২. রাধিকার ননদ কুটিলার জননী, ৩. সূর্যবংশীয় বাহু রাজার পুত্র, বিষযুক্ত, ৪. বালী ও সুগ্রীবের মা-ও বটে, আবার বাবাও বটে, প্রথম দু'য়ে ভল্লুক, ৮. ব্যাসজননী শান্তনু রাজমহিষী, ১০. পুরাণোক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ঋষিবিশেষ (সংখ্যায় ষাট হাজার), ১১. ঔষধাদির জন্য গাছ-গাছড়া, ১২. যোগলব্ধ ঐশ্বর্যবিশেষ, বশ করিবার শক্তি।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৪৪
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম

■	অ	পা	র	গ	■	প	থ্য
ভা	ং	■	গ	ঙ্গা	■	ঞ্চ	■
প	শু	■	■	সা	■	ত	■
■	মা	■	পা	গ	ল	পা	রা
কা	ন	■	■	র	ব	■	জা
লা	■	চ	■	■	■	■	■
■	প	র	শ	ম	ণি	■	চাঁ
■	■	ক	■	নু	■	■	দি

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৪৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ১ জুন ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বান্দা বৈরাগী।। ২৫

সিন্ধু দর্শনযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এ বছর ২৩ থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত সিন্ধু দর্শনযাত্রা হবে। যাত্রার সময় যাত্রীরা কাশ্মীর, কুলু, মানালি ইত্যাদিও দর্শন করতে পারবেন। ২৫ জুন মানস সরোবর যাত্রার জন্য লে থেকে বিশাল শোভাযাত্রা শুরু হবে। উল্লেখ্য, এই যাত্রা প্রায় ১৫ বছর আগে শুরু হয়েছে। তখন থেকে প্রতিবছর যাত্রা চলছে। লে-তে সিন্ধুনদীর তীরে যাত্রীরা সমবেত হন এবং নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সভা-সমিতি হয়ে থাকে। এই যাত্রায় পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশ নিয়েছেন।

নিউইয়র্কে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নিউইয়র্কে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা বিচারপতি হলেন ৪৩ বছরের রাজেশ্বরী। নিউইয়র্ক শহরের ক্রিমিনাল কোর্টের বিচারপতিপদে নিয়োগ করা তাঁকে। খুব কম বয়সে ভারত থেকে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন তিনি। বেশ কয়েকবছর রিচমন্ড কান্ট্রি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে কাজ করেছেন। কাজ করেছেন বিভিন্ন ক্রিমিনাল কোর্ট, ন্যাপাটিকস্, সুপ্রিম কোর্ট, সেক্স ক্রাইম স্পেশাল ভিকটিম ব্যুরোতে। নিউইয়র্কের ক্রিমিনাল কোর্ট ও ফ্যামিলি কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শহরের মেয়র আনুষ্ঠানিক কয়েকজনকে নিয়োগ করেছেন আগামী দশ বছরের জন্য। রাজেশ্বরী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নিয়োগের পর মেয়র বিল ডে ব্লাসিও বলেন, নিউইয়র্কের সকল বাসিন্দা একটা স্বচ্ছ আইন ব্যবস্থা চান। আমরা তাই এই পদের জন্য সৎ ও শিক্ষিত মানুষ হিসেবে রাজেশ্বরীকে নিয়োগ করলাম। নতুন দায়িত্ব পেয়ে রাজেশ্বরীও মুগ্ধ ও গর্বিত। তিনি বলেছেন, এটা আমার কাছে একটা স্বপ্ন। আমার মতো আরো ভারতীয় যদি এই ধরনের উচ্চপদে বসে, সেটাও আমার কাছে একটা গৌরবের বিষয় হবে।

বৃটেনে বিবেকানন্দ-মূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইউকে (ইউনাইটেড কিংডম)-তে ব্রেন্ট ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে বসল স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি। উদ্যোগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এলিং রোড ওয়েবলি নামক জায়গায় বি আই এ মূলত একটি 'কমিউনিটি রিসোর্সেস সেন্টার।' যেটা শুধুমাত্র ভারতীয়দেরই একটি সংস্থা। যেখানে নিয়মিত সৎসঙ্গ এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সেই ক্যাম্পাস চত্বরে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যবাহ ধীরুভাই শাহ এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্রেন্ট কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র, হ্যারোর বোরো ও ব্রেন্ট কাউন্সিলের বিভিন্ন নেতা-নেত্রী। এর আগে বৃটেনে রবীন্দ্রনাথ, এবং মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি বসলে এই প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি স্থাপিত হলো।

সরস্বতীর উদ্‌গমস্থলে খননকাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হরিয়ানার বিলাসপুরে গত ২১ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সরস্বতী নদী পুনরুত্থানের জন্য খননকার্যের শুভারম্ভ হয়েছে। এই যোজনার জন্য হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টার ৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। শুরুতে এই যোজনা ১০০ দিনের কাজের আওতায় করা হবে এবং পরে তা শিবালিক বিকাশ বোর্ডের অধীনে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে হরিয়ানা সরকারমন্ত্রক। সরস্বতী নদী আগে যমুনানগর জেলার ৪১টি গ্রাম দিয়ে বয়ে যেত, উদ্গমস্থল আদিবদ্রীতে অবস্থিত। সরস্বতীর ধারা সোন নদীতে মিশত। এখন সরস্বতী বিলুপ্ত। এজন্য পুনর্জীবিত করার অভিযান শুরু হয়েছে। খননকার্যের দিন হরিয়ানা বিধানসভার অধ্যক্ষ কম্বরপাল, সরস্বতীনদী গবেষণা সংস্থার অধ্যক্ষ এবং আম্বালার সাংসদ রতনলাল কাটারিয়া উপস্থিত ছিলেন।

পাক হিন্দুদের ভারতের নাগরিকত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অন লাইনে ভিসার আবেদন করতে পারবে সংখ্যালঘু পাক হিন্দুরা। সে দেশের ৬০ হাজার হিন্দু উদ্বাস্তুকে ভারতের নাগরিকত্ব দিতে তৎপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এর জন্যে দীর্ঘকালীন মেয়াদের ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে তাদের। সূত্রের খবর, পাকিস্তানে এই সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন কষ্টের সম্মুখীন হওয়াতেই তারা এদেশে আসতে চায় এবং পাকাপাকি ভাবে থাকতে চায়। তাই দীর্ঘকালীন মেয়াদের ভিসা বা লং টার্ম ভিসা (এল টি ভি) দেওয়া হবে তাদের। আবেদনের ফর্ম অনলাইনে পেলেও তা হাতে হাতে জমা দিতে হবে বলে জানা যায়। এই আবেদনের জন্য ফর্ম মিলবে www.Indianfrro.Gov.In/frro-ওয়েবসাইটে।

আর এস এসের নিন্দা করায় আদালতে রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৪ সালের ৬ মার্চ লোকসভা নির্বাচনের সময় ভিওয়ানদিতে এক নির্বাচনী জনসভায় রাহুল গান্ধী মহাত্মা গান্ধীর হত্যার জন্যে আর এস এসকে দায়ী করেছিলেন। এই ঘটনার পর রাজেশ কুণ্ডে নামে এক স্বয়ংসেবক রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এই মন্তব্যের জেরেই মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ভিওয়ানদির আদালতে হাজিরা দিতে হয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে। গত ৭ মে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে সশরীরে উপস্থিতি থেকে ছাড় দিয়েছিল। স্বয়ংসেবকের করা মানহানি মামলার জল কত দূর অবধি গড়াতে পারে তা অনুমান করেই তিনি হাজিরা দেন আদালতে। এ প্রসঙ্গে রাজেশ কুণ্ডে জানান, আর এস এসের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই জেনে বুঝে এমন মন্তব্য করেছেন রাহুল গান্ধী।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
18 May - 2015 - Rs. 10.00

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

দাম : ১০.০০ টাকা